University B. T. Questions

AND

Answers in Bengali

PAPER 1—IV

1961—62

BY

A SCHOLAR

Price Rs. 1·25 nP.

B. T. Questions & Answers in Bengali

Paper I—Principles of Education including Educational psychology.

1961

Q. 1. Define as precisely as you can each of the following terms and show how they are related—

Education. Instruction, Discipline and Development.

Ans. Education—স্বাভাবিক শিক্ষা বা নিসর্গশিক্ষা বা পরাবিদ্যা।

যে শিক্ষা দ্বারা মানুষের শরীরের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পূর্ণ ও সুশৃঙ্খল বিকাশ সাধন হয়, ইন্দ্রিয় নিচয় দক্ষ, শক্তিশালী ও কার্যক্ষম হয়ে ওঠে, বিভিন্ন মনোবৃত্তির সর্বাঙ্গীন স্ফুরণ হয়, এবং স্মৃতি, প্রজ্ঞা, মেধা, স্থৈর্য, যুক্তি প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি নিচয় কুশল ও প্রখর হয়ে ওঠে সেই শিক্ষাকেই স্বাভাবিক শিক্ষা বলে। অর্থাৎ মানুষের দেহগত ও মনোগত অন্তর্নিহিত বৃত্তি নিচয়ের শিক্ষাই স্বাভাবিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। ভাষান্তরে বলা যায় স্বাভাবিক শিক্ষা দ্বারাই মানুষের দৈহিক ও মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটে। এশিক্ষাকেই আবার বৃদ্ধি, উন্নয়ন বা আত্মবিকাশ বলেছেন শিক্ষাবিদগণ। সুতরাং শিক্ষার তাত্ত্বিক সংজ্ঞা হচ্ছে যাহা আছে তার বিকাশ।

Instruction—শিক্ষণ, শেখা, বাহ্যশিক্ষা, প্রতিষ্ঠানিকশিক্ষা বা অপরাবিদ্যা।

এই প্রকারের শিক্ষা মানুষ দ্বিবিধ উপায়ে লাভ করে—

(১) ব্যক্তি শিক্ষা বা সমাজ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা—কার্যগত অভিজ্ঞতার দৃষ্টিতে স্বাভাবিক শিক্ষালব্ধ বিকশিত বৃত্তিনিচয় কিভাবে বহির্জগতে কাজে লাগান যায় সেই সম্পর্কে শিক্ষকগণ যে মৌখিক বা প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেন সে শিক্ষাকে ব্যক্তি শিক্ষা বা সমাজ থেকে প্রাপ্তশিক্ষা বলা যায়।

(২) ব্যবহারিক শিক্ষা—প্রকৃতিতে ও সমাজে মানুষ যে স্থান লাভ করে

এবং নিজ কর্ম্ম মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এসব বাহ্যবস্তুর জ্ঞান বা ভৌতিক জ্ঞানকে ব্যবহারিক শিক্ষা বলা যায়।

ব্যক্তি-শিক্ষা এবং ব্যবহারিক শিক্ষা উভয়েরই উৎস বহির্জগৎ, শুধু নিসর্গ শিক্ষা অন্তর হতে লাভ করা যায়।

এ আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে ব্যক্তি শিক্ষা, স্বাভাবিক শিক্ষা ও ব্যবহারিক শিক্ষাকে যুক্ত করে।

Discipline—আমরা যাকে শৃঙ্খলা বলি তারই ইংরেজী প্রতিশব্দ 'Discipline' এ শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'disciplina' থেকে। কথাটির অর্থ শিষ্য বা ছাত্র বা শিক্ষার্থীর শিক্ষা। এ শিক্ষা বলতে শিষ্যের মানসিক, দৈহিক, নৈতিক বা সব কিছু শিক্ষাই বোঝায়। বাঙলা শৃঙ্খলা শব্দটির মধ্যে বিশেষ ব্যঞ্জনা নেই। শৃঙ্খলা শব্দটির বাঙলা অভিধানিক অর্থ রীতি, নিয়ম ধারা ইত্যাদি। Discipline কথাটির অনুরূপ অর্থ যুক্ত ব্যঞ্জনা রয়েছে বাঙলার শিষ্টাচার কথাটির মধ্যে। শিষ্ট কথাটির অর্থ সুশীল, বিনীত নীতিজ্ঞ ইত্যাদি। শিষ্ট + আচার—শিষ্টাচার বা শিষ্যের আচার।

শিক্ষা অভিধান (Dictionary of Education) discipline শব্দটির নিম্নরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করে :—

(i) কোন মহৎ উদ্দেশ্যানুযায়ী শিক্ষার্থীর অভিষ্ট ফল লাভের নিমিত্ত তার আশা, আকাঙ্খা, আগ্রহ ও আবেগ সমূহ সংযুক্ত ভাবে একটি প্রণালীতে পরিচালিত করা।

(ii) স্বনির্বাচিত কোনও মহৎ আদর্শ লাভের জন্য বিরামহীন, নিরলস ও সক্রিয় ভাবে কাজ করা।

(iii) কর্তৃপক্ষের দ্বারা শিক্ষার্থীকে পুরস্কার বা তিরস্কার দ্বারা সঠিক পথে চালিত করা।

(iv) কোন বিরূপ কাজের জন্য শিক্ষার্থীকে দমন করা।

উপরোক্ত আলোচনা হতে সহজেই বোঝা যায় যে শৃঙ্খলার উৎস মানব প্রকৃতিতে নিহিত। সার্থক শিক্ষায় প্রকৃতিজ শৃঙ্খলাই মূল শর্ত। সুতরাং শৃঙ্খলা ছাড়া শিক্ষা লাভ করা সম্ভব নয়।

Development—বৃদ্ধি বা উন্নয়ন বা বিকাশ।

মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ বা বৃদ্ধি কথাটি শিক্ষাতত্ত্বের দিক থেকে অতি চমৎকার কথা তাতে সন্দেহ নেই। ইহা মানব জীবনে জন্মের সূচনা হতে মৃত্যু পর্যন্ত একটি ক্রম বর্দ্ধমান, গতি শীল ও বিরামহীন প্রকৃক্রিয়া,

যার সমাপ্তিনেই এবং যার ক্রমবৃদ্ধি বা উন্নতিই একমাত্র ব্যঞ্জনা। বৃদ্ধি হল দৈহিক কাজ উন্নতি হল মানসিক কাজ। জীবের জন্ম বৃত্তান্তের রহস্যে এ প্রাকৃতিক সম্ভাবনা সমূহ বর্তমান। এই ক্রম বৃদ্ধি বা মানসিক উন্নতি গতিশীলতা লাভ করে দেহ এবং মনের খাদ্য অবলম্বন করে। খাদ্য বস্তু এবং পানীয় হল দেহের খাদ্য আর জ্ঞান কণিকা হল মনের খাদ্য। মানব শিশু তার শিক্ষা কার্যে বাল্য, কৈশোর ও সাবালকত্ব লাভের জীবন পরিক্রমায় বিভিন্ন স্তরে নিজ কর্ম মাধ্যমে এই দ্বিবিধ খাদ্য অবলম্বন করে দেহের বৃদ্ধি ও মনের উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, এবং তার চরিত্র গঠিত হয় বা ব্যক্তিত্বের বিকাশ বা আত্মবিকাশ ঘটে। এ বিষয়ে বাহির থেকে কিছু কোরবার নেই।

শিক্ষাতত্ত্বের দিক থেকে উক্ত চতুর্বিধ শিক্ষা কার্যের সম্বন্ধ নির্ণয়ের প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কারণ শিক্ষাতত্ত্বের আলোচনাতে নানা কূট প্রশ্নেরও উদ্ভব ঘটে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আমরা দেখতে পাই যে শিক্ষাকার্যে শিক্ষা, শৃঙ্খলাও বৃদ্ধি হল একটি অবিচ্ছিন্ন প্রণালী সূচক কাজ এবং ব্যক্তি শিক্ষা বা ব্যবহারিক শিক্ষা উদ্দেশ্য লাভের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি। সুতরাং এই চতুর্বিধ কাজ পরস্পর সংযুক্ত।

Q. 2. Critically examine the different views regarding the aims of education. What is in your opinion should be the ultimate aim of education ?

Ans. "ন প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য মন্দোঽপি প্রবর্ততে।" বিনা প্রয়োজনে কোনো সামান্য কাজও করা হয় না। কাজেই শিক্ষার মতো বিরাট কার্যকলাপের পেছনেও যে একটা উদ্দেশ্য আছে বা থাকা উচিত—একথা সুস্পষ্ট। কিন্তু কী সে উদ্দেশ্য ? এ বিষয়ে মতভেদ অনেক।

জীবনের যে কোনও প্রশ্ন গভীরভাবে বিবেচনা করতে গেলে শেষ পর্যন্ত তা দার্শনিক প্রশ্নে পরিণত হয়। এজন্য দর্শনশাস্ত্রকে "সমস্ত বিজ্ঞানের বিজ্ঞান" (science of all sciences) বলে।

দর্শন হচ্ছে সত্যের সন্ধান, যেখানে বিজ্ঞানের শেষ—সেখানে দর্শনের শুরু। বিজ্ঞান যেখানে অক্ষম ; দর্শন আমাদের জিজ্ঞাসাকে সেখানে পথ করে দেয়। বাস্তব, জীবন ও জগতের স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে দর্শনের চির-জিজ্ঞাসা। বিষয়টি জটিল। তাই শেষ উত্তর হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই—আজও মেলেনি। যাও মিলেছে—তাতেও রয়েছে প্রচুর মতবিরোধ। "নাসৌ মুনি যস্য মতং ন ভিন্নং"।

কিন্তু এত অসম্পূর্ণতা ও মতবিরোধ সত্ত্বেও জীবনের উপর এর প্রভাব অসীম। পথ অচেনা ও বিভিন্নমুখী বলে থেমে থাকবার তো উপায় নেই—জীবন পথে আমাদের চলতেই হয়। জীবনে সর্বদাই এদিক না হয় ওদিক—আমাদের বেছে নিতেই হবে। সে সময় আমরা আমাদের সেই সংশয়াকুল অসম্পূর্ণ দার্শনিক ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হ'তে বাধ্য—মুখে আমরা যাই বলি না কেন। ওমর খৈয়ামের যে জীবন দর্শন তাতে তাঁর পক্ষে পেয়ালাও সাঁকী বেছে নেওয়াই স্বাভাবিক। অপরদিকে নরোত্তম দাসের ভক্তি-তত্ত্বসার পড়ে বিষয়বৈরাগ্যের ভাবোদয় অনিবার্য। চার্বাক মুনি বিশ্বাস করতেন যে ভস্মীভূত দেহ কখনও ফিরে আসে না। তাই তিনি ঋণ করেও ঘি খাওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। অথচ এরকম অনিত্যবাদী জীবন দর্শনের প্রভাবে ক্ষুদিরামের মতো হাসতে হাসতে ফাঁসীর দড়ি গলায় পরা চলে না—এ কথাও সত্য। লোকে কী ভাবে, তার কাজ দেখেই তা বোঝা যায়। যাঁরা বলেন—আমরা কিছুই বিশ্বাস করি না, কিছুই মানি না—তাঁরা ভুলে যান যে এও এক ধরণের সংশয়বাদী জীবনদর্শন। ওমর খৈয়ামের "খাও-দাও—মৌজ কর" জীবন দর্শনের সঙ্গে এর বিশেষ পার্থক্য নেই।

কাজেই একথা স্পষ্ট যে জীবনের উপর দর্শনের উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে। আর আমরা লক্ষ্য করেছি যে জীবনই শিক্ষা শিক্ষাই জীবন। কাজেই বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদানুযায়ী যুগে যুগে, দেশে দেশে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে শিক্ষার লক্ষ্যও হয়েছে পৃথক। তাই দর্শনশাস্ত্রকে বাদ দিয়ে শিক্ষানীতির আলোচনা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এও লক্ষ্য করার বিষয় যে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদগণ অনেকেই প্রখ্যাত দার্শনিক, উদাহরণ স্বরূপ সক্রেটিস, প্লেটো, এরিষ্টটল, যীশু জনলক্, রুশো, জর্জ বার্ণার্ড শ', রাসেল, হোয়াইট হেড্, অণ্ডুয়ার্প হাক্সলি ও ডিউই'র নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। আমাদের দেশের বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথেরও জীবন দর্শনসম্বন্ধে ধারণা ও মতামত খুবই সুস্পষ্ট ছিল—একথা বলাই বাহুল্য মাত্র।

ইতিহাসের উষাকাল—শান্তসামগানের যুগের শুরু থেকেই ভাববাদী দার্শনিকদের দৃঢ় বিশ্বাস যে এই দৃশ্যমান অনিত্য জগতের পেছনে রয়েছে এক চিরন্তন আধ্যাত্মিক সত্ত্বা—যাকে ভূমা, ব্রহ্ম, ঈশ্বর, আল্লা, জিহোবা অথবা স্বর্গীয় পিতা বলা হয়ে থাকে। জগৎ ও জীবনের অর্থোপলব্ধির চেষ্টায় তাঁরা আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হন। বিশেষ কোরে ভারতবর্ষের অনেক সাধক এমন দাবীও করে থাকেন যে তারা ঈশ্বরকে "প্রত্যক্ষ" করেছেন এবং

সকলের পক্ষেই তা করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে তাঁরা মনে করতেন যে আত্মোপলব্ধি অথবা পরলৌকিক উন্নতিবিধান কল্পে ক্রিয়াকলাপের উপরই শিক্ষাক্ষেত্রে বেশী জোর দেওয়া উচিত। সত্য শিব ও সুন্দরের আদর্শকে অনুসরণ করাই হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য। আর এ শুধু প্রাচ্যদেশের একচেটিয়া মতবাদ নয়। পাশ্চাত্য দেশেও ভূরি ভূরি ভাববাদী দার্শনিক ছিলেন এবং রয়েছেন। গ্রীসদেশের সক্রেটিস থেকে শুরু করে পরবর্তী যুগের কান্ট, হেগেল প্রভৃতি অনেকেই এ দলের সদস্য। স্বর্গীয় পিতার মতো সম্পূর্ণতা অর্জন অথবা "Truth, Beauty and Goodness" এর আদর্শানুসরণের সঙ্গে আমাদের বিশেষ কোনো পার্থক্য আছে কি? অধ্যাপক রস্ প্রকৃতিবাদী, বাস্তববাদী ও প্রয়োগবাদী দার্শনিকদের মতবাদ গ্রহণ কোরে শেষ পর্যন্ত এ পক্ষই সমর্থন করেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, ধর্মের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হ'লে জীবনের ও শিক্ষার কোনো আদর্শ ই বেশীদিন টিকতে পারে না। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে স্বামী বিবেকানন্দ বা ঋষি অরবিন্দের এ ধরনের অসংখ্য উক্তির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। যদিও বর্তমান যুগের চিন্তাধারার ওপরে ডারউইনের বিবর্তনবাদ, ফ্রয়েডীয় আচরণবাদী মনোবিজ্ঞান ও মার্ক্সের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রভাবের ফলে ভাববাদী দর্শন অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে—তবু আজও আমাদের চিন্তাধারা, কার্যকলাপ ও জীবনের ওপর যে এর উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে—সেকথা অনস্বীকার্য।

অথচ দৈনন্দিন জীবনে আমরা যাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করি তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলে দেখা যাবে তাঁরা শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসেবে বড়ো বড়ো কথা বাদ দিয়ে মোটা ভাত-কাপড়ের উল্লেখই করেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে ভবিষ্যৎ জীবিকার্জনের জন্য শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করে দেওয়া এবং শিক্ষা প্রত্যক্ষভাবে এ বিষয়ে যত সাহায্য করে ততই মঙ্গল। অনেকে হয়তো এমনও বলবেন যে সবরকম স্কুল কলেজেই ছেলেদের ইতিহাস, ভূগোল বিষয়গুলো পড়ানো বাদ দিয়ে সর্টহ্যাণ্ড, টাইপরাইটিং বা যে কোন বৃত্তি শিক্ষা এবং মেয়েদের কবিতা পড়ানো বাদ দিয়ে রান্না, গৃহবিজ্ঞান শেখানো অনেক ভালো। এমনও বলতে পারেন যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়ার ব্যবস্থা তুলে দিয়ে বাগান করা অথবা সেলাই শেখানো বাঞ্ছনীয়। বাস্তব জীবনের দিকে তাকিয়ে আমরা দেখতে পাই এসব কথার মধ্যে অনেকখানি নির্জলা সত্য নিহিত রয়েছে। অর্থোপার্জনের উপর নির্ভর করে আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা, মানসম্ভ্রম—সব কিছু। জীবিকার্জন বা পেশা তাই আমাদের জীবনের একটি অতি

প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু আবার একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে এ ধরনের আদর্শ অনুসরণের অসুবিধাও রয়েছে অনেক। আজকালকার গণতান্ত্রিক ও জটিল সমাজ ব্যবস্থার লেখাপড়া শেখানোর কোন বাস্তব উপ-যোগিতা নেই—এ ধারণাও তো ভুল। বাস্তব জীবন যাকে নেহাৎই কাস্তে হাতুরী চালাতে হবে, তার পেটেও যদি কিছু পরিমাণ পুঁথিগত বিদ্যা আয়ত্ত থাকে তাহ'লে অবশ্যই তার মনের প্রসারতা বাড়বে এবং দশজনের সঙ্গে মিলে-মিশে সামাজিক জীবন যাপনেও তার কিছুটা সুবিধে হবে। তাছাড়া জীবিকার্জনই তো মানুষের জীবনের সবটা নয়—অবসর বলেও একটা সময় রয়েছে। অনেকে তো বলেন, অবসরই হচ্ছে মানুষের জীবনের সবচেয়ে প্রিয় এবং মূল্যবান সময়। এমন কি শ্রমিকের কর্মক্ষমতাও অনেকখানি নির্ভর করে তার অবসর বিনোদনের রকমের ওপর। অফিস অথবা কারখানার কাজ ছাড়া বাইরের কোনো কিছুর দিকেই যার টান নেই—জীবনে যার কোন রকম সখ বা স্ফুর্তির বালাই নেই সে অন্য সবাইয়ের চাইতে মানসিক ও নৈতিক দিক থেকে অবশ্যই কিছুটা নিকৃষ্ট হয়ে পড়বে। কাজেই কার্যকরী শিক্ষালাভের আগ্রহে আমরা যাতে শুধু রুটি আর মাখনের ভক্ত না হয়ে পড়ি এবং 'পূর্ণিমার চাঁদকেও' ঝলসানো রুটি বলে ভুল না হয়—সে বিষয়ে সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

এ যেমন বাস্তববাদীদের বাড়াবাড়ি, তেমনি প্রাচীন মুনিঋষিদের বাড়া-বাড়িও রয়েছে। তাঁরা আবার মনে করেন যে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা জ্ঞানার্জন শিক্ষার উদ্দেশ্য। এ আদর্শও স্পষ্টতঃই একদেশদর্শী। শিক্ষায় হয়তো বুদ্ধিবৃত্তির অনেকখানিই উৎকর্ষ সাধিত হ'তে পারে। কিন্তু তা হ'লেও যে ব্যক্তি-জীবনের এমন অনেক সদ্গুণ বাদ থেকে যায়—যা শিক্ষার মাধ্যমে বিকশিত হওয়া সহজ এবং সম্ভব।—তবে একথাও সত্য যে জানাশোনা সত্ত্বেও অবস্থার চাপে কার্যক্ষেত্রে আমরা অনেক ভুল পথ বা আদর্শও ত্যাগ করে উঠতে পারি না। (বাঁচার জন্য খাওয়া, খাওয়ার জন্য বাঁচা নয়—একথা তো সবাই জানে। কিন্তু অনেক সময় সারা জীবনের হিসেব খতিয়ে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয় যে, খাওয়া আর খাওয়ার জোগান দেওয়া ছাড়া জীবনে আর কোনো কাজই করা হয় নি।) প্রাণ বাঁচাতেই প্রাণান্ত। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাতেও অনেকটা এরকমের দুর্ঘটনা অহরহই ঘটে আসছে না কি? পরীক্ষার চাপে এবং তার ফলাফলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষভাবে জড়িত নানা পুরস্কারের লোভে আমরা তো অনেকদিন যাবৎই নোট মুখস্থ করাকে শিক্ষা ও জীবনের আদর্শ করে রেখেছি। আজও যে এ বিষয়ে আমাদের খুব দুঃখ লজ্জা বা সুবুদ্ধির উদয়

হয়েছে তাও তো মনে হয় না। পুঁথিগত বিদ্যারও মূল্য আছে এবং আমাদের জীবনে তার প্রয়োজনকেও কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু জীবন বা বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন "পুঁথির পোকা" যে কোনোমতেই শিক্ষার আদর্শ হ'তে পারে না। আজকের দিনে পৃথিবীর কোনো দেশে বা জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই "পণ্ডিত-মূর্খের" চাহিদা নাই।

এরকম চলতি আরও অনেক মতবাদ রয়েছে যার কোনোটাই পুরোপুরি সত্য নয়—অথচ প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু কিছু সত্যতা রয়েছে। কাজেই মতের বিভিন্নতা সত্ত্বেও শিক্ষাবিদগণ কি বলেন, বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন।

হার্বার্ট স্পেন্সার বলেছেন যে, পরিপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য প্রস্তুত হওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য। কথাটি ভাল এবং যদিও শিক্ষাজগতে বিস্তৃতর অর্থে এর অনেকটা মূল্য দেওয়া হয়েছে—তবু এ কথা সত্য যে "পরিপূর্ণ জীবনযাপন" বলতে কি বোঝায়—তা ব্যাখ্যা করা বড়ো শক্ত। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় সবিশেষ বর্ণনার সময় সবাই নিজের পছন্দ মতো তালিকা প্রস্তুত করেন—স্পেন্সারও তাহাই করেছেন। অনেকে তো মনে করেন যে জীবনের কোনো ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা লাভের চেষ্টা করা এক ধরনের পরিপূর্ণ বোকামি।

আর একটি উদ্দেশ্যের কথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে সেটি হচ্ছে ব্যক্তির "সুসমঞ্জস বিকাশ সাধন"। একদিক থেকে এটি বেশ সুন্দর কথা। ব্যক্তির আংশিক বা বিশেষ কোনো একটি দিকের ওপর জোর না দিয়ে তার শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিকগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ সাধনকেই লক্ষ্য করতে হবে। এই "সামঞ্জস্য" কথাটি একটি মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্যবিষয়। শিক্ষার্থীর অবস্থা যেন সেক্সপীয়রের বিয়োগান্ত নাটকগুলির হতভাগ্য নায়কদের মতো না হয়। হ্যামলেটের মতো অতিরিক্ত মাত্রায় চিন্তাশীলতা অথবা ওথেলোর মতো চিন্তাশক্তির স্বল্পতা কোনোটাই বাঞ্ছনীয় নয়। সে যেন শুধু চারুকলার চর্চায় ডুবে না যায় অথবা শরীর চর্চার বাড়াবাড়িতে 'ভীমসেন' না হয়ে বসে।

কিন্তু "সুসামঞ্জস্য বিকাশ সাধন" কথাটিতে একটি বিশেষ অসুবিধা এই যে এ থেকে শিক্ষার্থীকে কি শিক্ষা দিতে হবে—তার কোনো নির্দেশই পাওয়া যায় না। মনে হয় বিকাশ সাধনটাই আসল কথা—কিসের মাধ্যমে বা কীভাবে সে বিকাশ সাধিত হবে, সেটা ততো বড়ো কথা নয়। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব যেন কতকগুলো বৃত্তিতে বিভক্ত এবং সেগুলোর পৃথক পৃথক অনুশীলন ও বিকাশ সম্ভব। তাছাড়া "সামঞ্জস্য" কথাটি বড়োই বিপজ্জনক। শিক্ষক' অভিভাবক

এবং শিক্ষানুরাগী—মাত্রই লক্ষ্য করেছেন যে, ছাত্রদের কতক্ষণ পড়াশুনা করা উচিত, কতক্ষণ খেলাধূলো, আর কতক্ষণ খেয়াল খুশিমত কাজ করতে দেওয়া যেতে পারে, এ বিষয়ে মনস্থির করা কতো কঠিন। কতখানি আগ্রহ সুস্থ আর কতখানি আগ্রহাতিসয্যে ছাত্রের ভবিষ্যৎ জীবন বিপন্ন হয়—একথা কিভাবে বলা যেতে পারে? কাজেই বিষয়টি যে গোলমেলে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এই গোলমালের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অধ্যাপক রেমণ্ট চরিত্র গঠনের আদর্শকে গ্রহণ করবার উপদেশ দিয়েছেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীর আচার-ব্যবহার নিয়েই অনুশীলন করে থাকি; আধুনিক আচারণবাদী মনোবিজ্ঞান ব্যক্তির এই দিকটিকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে এবং বিশেষ জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি লাভ করেছে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে শিক্ষার্থীর মাংসপেশী, বুদ্ধিবৃত্তি অথবা আবেগানুভূতির বিকাশ সাধনের মাধ্যমে চরিত্র গঠনই প্রকৃত প্রয়োজন বলে মনে হয়। অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রে নৈতিক আদর্শই সবচাইতে বড়ো। এর অর্থ এই নয় যে, অন্যান্য আদর্শগুলিকে অবহেলা করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে সত্যিকারের চরিত্র গঠন করতে গেলে অন্যান্য গুণগুলি আপনিই এসে পড়বে এবং সব বৃত্তিই প্রয়োজন মাফিক বিকাশ প্রাপ্ত হবে।

আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় এই মতবাদটিও আগের কয়টির মতোই একদেশদর্শী। কারণ ব্যক্তির জীবনে ব্যবহারই তো সব নয়। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ব্যক্তির জীবনে ব্যবহার ও জ্ঞান—দু'য়েরই পৃথক স্থান রয়েছে। সুস্থ দেহ বা ব্যবহারের উন্নতি না হ'লে তো চরিত্র গঠনই হয় না। তাছাড়া বিজ্ঞান বা ব্যবহারিক শিক্ষাক্ষেত্রে "চরিত্র" গঠনের আদর্শের কি অর্থ করা যেতে পারে?

সেজন্য এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, অধ্যাপক রেমণ্ট "ব্যবহার" কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করেছেন এবং জীবনেরও শিক্ষার সর্বক্ষেত্রেই যে এই আদর্শ কাজে লাগানো যেতে পারে তা বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করেছেন। তথাপি এ ধরনের মতবাদ বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি—এ কথা সত্য।

আর এক দিক থেকে দেখতে গেলে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে সংস্কৃতি সঞ্চারণের আদর্শ অনেক বেশী সহজবোধ্য ও জনপ্রিয়।

পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন না করলে বেঁচে থাকাই অসম্ভব। আমাদের সকল প্রচেষ্টার মূলেই এই সামঞ্জস্য স্থাপন—অথবা অভিযোজনের প্রেরণা কাজ করছে। অবশ্য পরিবেশ বলতে কি বোঝায়, তা ভালভাবে মনে রাখতে হবে। যা কিছু আমাদের চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে তাকেই আমাদের সর্বাত্মক পরিবেশ বলা চলে না। প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ, কাছের বা দূরের—যা কিছু মানুষের কাজকে "প্রভাবিত" করে তাকেই পরিবেশ বলে বুঝতে হবে। তেনজিং নোর যদি রাজধানীর কোনো অভিজাত সরাইখানার আরাম কেদারায় বসে ও বিশ্রাম করতে থাকেন, তবু একথা মানতে হবে যে মাউণ্টএভারেস্ট তাঁর কাজ, চিন্তাধারা ও জীবনকে সব সময়ই প্রভাবিত করছে। কাজেই তাঁর জীবনে অভিজাত সরাইখানা নেহাৎই একটা প্রাসঙ্গিক ঘটনা—মাউণ্ট এভারেষ্টই প্রকৃত পরিবেশ। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখতে হবে যে পরিবেশেরও পরিবর্তন সম্ভব। পশুর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য এই যে, সে প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করতে পারে। কাজেই সামঞ্জস্য স্থাপন ক'রবার জন্য পরিবেশের সমস্ত রকমের সুবিধা—অসুবিধা, ন্যায় ও অন্যায় দাবীই যে নতমস্তকে মেনে নিতে হবে—এমন কোনো কথা নেই এবং তা বাঞ্ছনীও নয়। জীবনে "মানবো" এবং "মানাবো"—এই দু'টো দিকই আছে।

অপরদিকে সংস্কৃতি সঞ্চারণের কথা, মানুষের এবং মনুষ্য সমাজের সবচাইতে মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে—তার বহু যুগ সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান ভাণ্ডার। এই সম্পদকে আশ্রয় কোরে এবং কাজে লাগিয়ে জীবনপথে অগ্রসর হয় বলেই মানুষ পশুকে জীবন যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছে। সর্বদেশের, সর্বকালের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীদের হাতে জ্ঞান ভাণ্ডার পৌঁছে দেওয়া।

শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষাবিদ্গণের যার যে রকম ধারণা, তিনি শিক্ষার সেই রকম উদ্দেশ্যই নির্দেশ কোরেছেন।

ডিউই বলেছেন যোগ্য সামাজিক দক্ষতা অর্জনের জন্য মানুষের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাবে শিক্ষা। শিক্ষাবিদ বার্গলে একেই ব্যাখ্যা কোরে বলেছেন যে, সামাজিক দক্ষতার জন্য চারটি জিনিস অপরিহার্য। প্রথমতঃ চাই অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা ও দক্ষতা অর্জন। দ্বিতীয়তঃ চাই এমন ন্যূনতম জ্ঞান ও বুদ্ধি যার সহায়তায় জগৎ ও জীবনকে বুঝতে পারা যায়। তৃতীয়তঃ চাই প্রতিবেশীর প্রতি মানবিক কর্তব্য পালনের

মনোভাব। চতুর্থতঃ চাই সমাজ স্বীকৃত নীতিবোধকে মেনে চলার যোগ্যতা অর্জন।

শিক্ষাবিদ্ হার্বর্ট শিক্ষার উদ্দেশ্যরূপে স্থির করেছেন চরিত্রগঠন। এই আদর্শ চরিত্রের জন্য বার্ট্রাণ্ড রাসেল চতুর্বিধ গুণ অর্জনের কথা বলেছেন। সেই চারটি গুণ হচ্ছে—দৈহিক স্বাস্থ্য ও সজীবতা, মানসিক নির্ভীকতা, শিল্প-সৌন্দর্য রসবোধের শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ।

অপরদিকে রিচার্ড লিভিংষ্টোন্ ফ্রেয়েবেল, ফিক্‌তে, কমেনিয়াস আমাদের দেশের মতো শিক্ষাক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতার প্রতি জোর দিয়েছেন। পেষ্টালৎসী চান সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ, রুশো ও মাদাম মণ্টেসরি শিশু স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের দাবী জানিয়েছেন। মহাত্মা গান্ধীর 'নঈতালিমের' পরিকল্পনা থেকে মনে হয় তিনি ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের বুনিয়াদ গড়তে চেয়েছেন এবং সেজন্য তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির নাম দিয়েছেন "বুনিয়াদী শিক্ষা"। সক্রেটীসের মতো দার্শনিক—যাঁরা নিউটনের মতো জ্ঞান—সমুদ্রের তীরে নুড়ি কুড়োতেই ভালবাসেন—স্বাভাবতঃই তারা জ্ঞানার্জনের উপর জোর দিয়েছেন। দার্শনিক, রাজনীতিবিদ্ রাধকৃষ্ণন বলেছেন যে, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে ব্যক্তির একটি সুষ্ঠু ধারণা গড়ে তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও এরিষ্টল চেয়েছিলেন সুন্দর ও শোভন জীবন; রোমানরা চেয়েছিলো বাগ্মীতা আর লক্ চাইলেন একাধারে সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন।

এ পর্যন্ত আমরা যে আলোচনা করেছি তাতে শিক্ষাকে মোটামুটি ব্যক্তিজীবনের প্রয়োজন হিসাবেই দেখা হয়েছে। কিন্তু কোনো ব্যক্তিই তার সামাজিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করতে পারে না। মানুষ হচ্ছে সামাজিক জীব। কাজেই শিক্ষার আদর্শ সব সময়ই সামাজিক পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

এ বিষয়ে বিচার-বিবেচনা করতে গেলে আমাদের দু'টি বিপরীত মতের সম্মুখীন হ'তে হয়। কোনো কোনো দার্শনিক ও শিক্ষাবিদের মতে ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থ ও কল্যাণ পরস্পর বিরোধী। কাজেই ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে কার দাবী বেশী—এ নিয়ে তুমুল মতবিরোধ বহু দিন ধরে চলেছে এবং এ বিরোধ আজ একেবারে থেমে গেছে তাও নয়। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সমাজের দাবীকে, কেউ বা ব্যক্তির দাবীকে বড়ো করে তুলে ধরেছেন। প্লেটো ও এরিষ্টটল তো ব্যক্তিকে সমাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা বলতেন, সমাজ একটি জীবিত সত্ত্বা। একটি জীবিত

সত্বার সম্পূর্ণ অস্তিত্ব ছাড়া হাত-পায়ের মতো বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যেমন পৃথক কোনো মূল্য নেই, তেমনি সমাজের সমষ্টিগত মঙ্গলামঙ্গল থেকে আলাদা কোরে ব্যক্তির কল্যাণের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। পরবর্তী যুগে হেগেল প্রমুখ একনায়কতন্ত্রী দার্শনিকদের মতবাদে এরই চরম এবং বিপজ্জনক প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। অপরদিকে খ্রীষ্টধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির দাবী মাথা তুলে দাঁড়ায়। ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতিই সেখানে বড়ো কথা, পার্থিব অন্য কোন কিছুরই পরোয়া করবার কথা সেখানে নেই। পরবর্তী যুগে রুশো প্রমুখ দার্শনিকগণও ব্যক্তির দাবীকে সবার উর্দ্ধে স্থান দিয়েছেন। অবশ্য তৎকালীন ফরাসী বিপ্লবের যুগে তাঁদের কোনো আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য ছিল না।—বিকৃত সামাজিক প্রভাব থেকে মুক্ত কোরে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপনে শিশুকে অভ্যস্ত করাই এদের লক্ষ্য ছিল।

কিন্তু ব্যক্তি ও সমাজকে অথবা তাদের স্বার্থ ও কল্যাণকে এ ধরনের আলাদা কোরে দেখা ঠিক নয়। ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সমাজের কথা ভাবা যায় না আর সমাজকে বাদ দিয়ে ব্যক্তির কল্পনা করাও দুরূহ। তারা পরস্পরের পরিপূরক বললেও সবটা বলা হয় না। প্রকৃতপক্ষে এ এ দু'য়ের কোনো পার্থক্যই দেখা যায় না; গাছ ও অরণ্যের মধ্যেই যে পার্থক্য ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যেও তাই।

এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই ম্যাকডুগাল, নান্, ডিউই প্রমুখ আধুনিক শিক্ষাবিদগণ ব্যক্তি ও সমাজের দাবীকে পরস্পর বিরোধী বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন। বরং তাঁরা একথা প্রমাণিত করেছেন যে, এ দু'য়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। সমাজের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কোরে পরস্পর সহযোগিতার, আদান প্রদানের পথ রুদ্ধ কোরে—ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও কল্যাণ সাধন – অলস কল্পনা। অপরদিকে সুস্থ, সবল ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর না কোরে কোনো সমাজই দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। তাই বর্তমান যুগের শিক্ষাদর্শ – একদিকে শিশু কেন্দ্রিকতা, অপর দিকে সামাজিককরণ।

দেশের রাজনৈতিক অবস্থার ওপরও দেশের শিক্ষাব্যবস্থা অনেকখানি নির্ভরশীল—এ বিষয়ে বোধ হয় কেউরই দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। দেশের সার্বভৌম শাসনক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে রয়েছে। স্বায় শাসনাধিকার বজায় রাখবার জন্য এবং দেশের জনগণের জীবনের নিয়ন্ত্রণ ও উন্নতি বিধানের জন্য স্বভাবতঃই রাষ্ট্র দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ কোরে আসছে। ইতিহাসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রও যতো ব্যাপক ও ক্ষমতাশালী হয়ে উঠছে—জনসাধারণের সর্বক্ষেত্রেই

তার হস্তক্ষেপ ততোই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থাও তার হাত থেকে রেহাই পায়নি পাবার কথাও নয়। বর্তমানে অবশ্য রাষ্ট্রের স্বরূপ পরিবর্তন হয়েছে। শাসন ও শোষণ নয়—জনকল্যাণের জন্যই নির্বাচনমূলক গণতান্ত্রিক সরকার। তাই দেখতে পাই, মুদালিয়ার ও রাধাকৃষ্ণণ কমিশন স্বাধীন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার পরিপেক্ষিতেই শিক্ষার লক্ষ্যের পুনর্বিন্যাস করেছেন এবং দেশের প্রয়োজনমাফিক সহযোগিতা, সামাজিক নীতিবোধ, সহনশীলতা ও নেতৃত্বের শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছেন।

শিক্ষা-জীবনের প্রতিক্ষেত্রে দেশের এবং তার ব্যক্তিগত অবস্থার প্রভাব সুস্পষ্ট। পিতামাতার আর্থিক স্বচ্ছলতা অথবা অনটন তাঁদের সামাজিক মান-মর্যাদানির্দিষ্ট কোরে দেয় এবং পুত্রকন্যার ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করে। কাগজে কলমে সারা পৃথিবীই আজ গণতান্ত্রিক হয়ে উটেছে বটে, কিন্তু বাস্তবের খবর যারা রাখেন—তাঁরা এ বিষয়ে বিশেষ আশার আলো দেখতে পান না। আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুণ কত শিক্ষার্থী স্বাস্থ্য, খেলাধুলা, লেখাপড়া ইত্যাদি সকল বিষয়েই পিছিয়ে যায় এবং জীবনের লক্ষ্য নির্দ্ধারণে স্বল্পব্যয়ের একটা শিক্ষা-পরিকল্পনা বেছে নেয়—তা কারও অজানা নাই।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর সামরিক ও ধর্ম, সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের কতখানি প্রভাব ছিল তার স্বাক্ষর ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় রয়ে গেছে। আমাদের দেশের রাজর্ষি, পুরোহিত ও পাশ্চাত্য দেশের পোপ, বিশপ ইত্যাদির কথা সর্বজনবিদিত। সামরিক প্রভাবের প্রকাশ স্পার্টা থেকে সুরু কোরে আমাদের দেশের বর্তমান যুগের স্কাউট, এন, সি, সি পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে।

উপরোক্ত শিক্ষার লক্ষ্যসমূহ হতে আমরা পাই—আসন্নলক্ষ্য (Proximate aim), চরমলক্ষ্য (Ultimate aim) শঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্য (Narrower aim), ব্যাপক উদ্দেশ্য (Broader aim), ব্যক্তিসাতন্ত্রবাদ (Individualistic aim), সমাজতন্ত্রবাদ (Socialistic aim), চরিত্র গঠন মতবাদ (Formation of character), জীবন যাপন প্রণালী মতবাদ (Mode of complete living), পারিবেশিক অভিযোজন মতবাদ (Adjustment to enironment) আরও কত বিচিত্র মতবাদ।

আলোচনা এতদূর অগ্রসর হওয়ার ফলে একথা স্পষ্টই বলা যায় যে শিক্ষার এটি স্থির ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা অসম্ভব। এজন্য ইংরেজী ভাষায় "শিক্ষার লক্ষ্য কথাটি সাধারণতঃ বহুবচনেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাজেই

আমাদের কর্তব্য হবে, রাজহাঁসের মত জলমিশ্রিত দুধ থেকে সারসংগ্রহ কোরে নেওয়া, অথবা, সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োগবাদী দার্শনিক ডিউই'র আশ্রয় গ্রহণ করা। তাঁর মতে—শিক্ষা জীবনের মতোই ব্যাপক ও পরিবর্তনশীল। কাজেই শিক্ষার কোনো স্থির, অচঞ্চল ও ধ্রুব" লক্ষ্য থাকতে পারে না এবং থাকা বাঞ্ছনীয়ও নয়। জীবনের সমস্যা সমাধানে যা কিছু কার্যকরী বলে গণ্য হবে তাকেই গ্রহণ করা হবে। শুধু শুধু—আরাম কেদারায় বসে সুদীর্ঘ ও জটিল তাত্ত্বিক আলোচনার কোনো মূল্য নেই। 'পুডিং এর স্বাদ খেয়েই বুঝতে হয়। আমাদের দেশেও কথা আছে—"ফলেন পরিচীয়তে'। শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে এতো বিভিন্নমুখী মতবাদের কারণ এই যে, জীবন বিচিত্র এবং তার সম্পূর্ণ কেউই ধরতে পারে না। কাজেই কোনো মতবাদকে নির্দিষ্ট রূপ দিতে গেলে তা একদেশদর্শী হয়ে পরতে বাধ্য।

কাজেই বাস্তবক্ষেত্রে দেশকাল পাত্রানুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য বারবার পর্যালোচনা কোরে দেখতে হয়। নান বলেছেন—প্রত্যেক ব্যক্তির শিক্ষার লক্ষ্য পৃথক পৃথক হ'তে বাধ্য! কাজেই এ বিষয়ে কোনোরকম গোঁড়ামি পোষণ করা চলে না।

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দূরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়োঃ বদন্তি"।

Q. 3. The child should be the starting point the centre and the end : his development his growth is the end.

Justify Or, criticise the existing Secondery School curriculum in the light of the above statement.

Ans. ১৯৫০ সালের paper I ৩নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

Q. 4. "Children are born with a biological heritage : They are born into a social heritage." Discuss.

Ans. ১৯৫০ সালের paper I ৭নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

Q. 5. Discuss the importance of home as one of the most effective social agencies of education. How far can it be regarded as the first training ground of character ?

Ans. মনুষ্যহীন শূন্যতার মধ্যে মানুষ জন্মগ্রহণ করে না, সমাজের কোন একটি গৃহে বা পরিবারেই জন্মগ্রহণ করে। এই সমাজ ও পরিবার মানবগোষ্ঠী

ছাড়া কিছুই নয়। পরিবার হ'ল এমন একটি মানবগোষ্ঠী (In group) যাহার ভিতরের প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে প্রত্যক্ষ জ্ঞাতী সম্পর্ক বিদ্যমান। যেমন স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, ভাই-বোন, খুড়ো-ভাইপো ইত্যাদি। যে পরিবার যত বড়, সম্পর্কের সূত্রও সেখানে তত বিস্তৃত ! এরূপ বৃহৎ মিলনের ফলে সেখানে বড় একটি যৌথপরিবার (Joint Family) গড়ে ওঠে। গ্রামীণ ভারতবর্ষের সেকালের পরিবার সাধারণতঃ যৌথ প্রণালীর ছিল। কিন্তু আধুনিক সমাজে একক পরিবার (Single Track Family) গঠনের মনোভাব বেশী প্রবল, কারণ শিল্প প্রধান শহুরে সমাজে কর্মজীবনের বৈচিত্র ও ব্যাপকতা এত উদগ্র যে যৌথ পরিবারের কর্মক্ষম স্বজনরা ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে চলে যায় ও স্বতন্ত্রভাবে বসবাস করতে বাধ্য হয় এবং অবশেষে অনিবার্যভাবে যৌথ পরিবার ভেঙে পড়ে। এছাড়াও অন্যান্য অর্থনৈতিক কারণে আধুনিক যুগে সেকালের যৌথ পরিবারের ভিত শিথিল হয়ে পড়েছে। কিন্তু পরিবার একক বা যৌথ যে ধরনের হউক না কেন, পারিবারিক গোষ্ঠীভূক্ত ব্যক্তিদের আত্মীয়তার সম্পর্কই পরিবারের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পারিবারিক গোষ্ঠীর অন্তরঙ্গতা নিবিড় এবং ব্যক্তিজীবনের তার প্রভাব গভীর। আধুনিক শিল্প বিজ্ঞানের যুগে মানুষের সমাজ জীবনের ধারার সঙ্গে পারিবারিক জীবনের ধারারও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে আরও ঘটবে। কিন্তু পরিবারের সামাজিক ভূমিকার গুরূত্ব বিশেষ কমেনি। সুদূর অতীতকালের মানুষের সমাজবদ্ধ জীবনের সূচনা হতে আজ পর্যন্ত, পরিবারের অন্তরঙ্গ ঘরোয়া পরিবেশের প্রভাব মানুষের জীবনে অক্ষুন্ন রয়ে গেছে। পরিবার হল সমাজ জীবনের প্রথম স্তর। মানুষ বৃহত্তর সমাজ জীবনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে পরিবারের মধ্যে। মানুষ পরিবারে কেবল ধনোৎপাদনের শিক্ষা লাভ করে না, বা ব্যক্তিগত স্বত্ব ও অধিকারে সচেতন হয় না, গোষ্ঠীবদ্ধ বা সমবায় জীবন যাপন করতে হলে ব্যক্তি হিসাবে মানুষের কর্তব্য ও সুযোগ সুবিধা কি, সে সম্বন্ধেও শিক্ষা লাভ করে। সংস্কৃতি বলতে যা বুঝায় তার সব কিছু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে মানুষ গৃহে। মানুষের চরিত্র, আদর্শ, ধ্যান-ধারণা, আচার-ব্যবহার, দৃষ্টিভঙ্গী ভাল মন্দের মূল্যায়ন-বোধ ও সমাজবোধ সব কিছুই গড়ে ওঠে পারিবারিক জীবনের মধ্য দিয়ে। মনোবিদগণ বলেন, মানব চরিত্রের বুনিয়াদ গড়ে ওঠে বাল্যকালে ও কৈশোরে। সব মানুষেরই জীবনের এ সময় কাটে পারিবারিক পরিবেশে।

এর পরে paper II ৮৬ পৃষ্ঠার শেষ "গৃহে পিতাকে হতে আরম্ভ করে সংশ্লিষ্ট অংশ দ্রষ্টব্য।

Q. 6. "It is the exemplar of an educated person that the teacher is, it is the stimulation and inspiration which he generates, it is the personality that he radiates......which make him the great formative force."

Ans. Paper II ৮ (d) নং প্রশ্ন (পৃঃ ৬৫) দ্রষ্টব্য।

Q. 7. Devolop the idea that the school is a Society in miniture,

Ans. মানুষের জীবন সমাজের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। সমাজ ছাড়া মানুষের বিকাশ সম্ভব নয়, তা সমাজের উপযোগী করেই তো জীবনকে গড়ে তুলতে হবে। গোড়ার দিকে ভাবতে গেলে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পিছনে অজ্ঞাতভাবে কি এই উদ্দেশ্য ছিল না? জীবনের বিবিধ শিক্ষার ভার যখন শিক্ষায়তনের উপর, তখন তার একটি অবশ্য কর্তব্য হবে বক্তির জীবনকে সম্পূর্ণ সামাজিক করে তোলা। আবার সামাজিক কথাটির ব্যাপকত্ব ধরলে এই কথাটির মধ্যেই রয়েছে ব্যক্তিতা বিকাশের কার্য। ব্যক্তিতার সর্বাঙ্গীন বিকাশ হওয়াও যা, সার্থক সামাজিক হওয়াও তাই। অর্থাৎ যথার্থ সামাজিক হওয়া মুখের কথা নয়, পরন্তু রীতিমত শিক্ষা সাপেক্ষ। সমাজ বিদ্যালয়ের উপর এই ভাড়ই দিয়েছে। সুতরাং শিক্ষার্থীকে সমাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা বিদ্যালয় শিক্ষার অবশ্য একটি কর্তব্য যদিও সামাজিক শিক্ষা শিক্ষার একটি দিক, একটি শিক্ষণীয় বিষয়।

যেহেতু সাধারণ সমাজের মধ্যেই বিদ্যালয়ের অবস্থিত সেই কারণে প্রথমটির প্রভাব দ্বিতীয়টির উপর স্বাভাবিকভাবেই পড়বে। বিদ্যালয়ের নিজস্ব সমাজ থাকলেও তা সমাজ বহির্ভূত অবাস্তব একটা কিছু হতে পারে না। এক কথায় বিদ্যালয়ের উপর সমাজের প্রভাব অনিবার্য। ছাত্র শিক্ষক এই বিদ্যালয় পরিবেশের মধ্যে তাদের দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে।

কেবল বিদ্যা বিতরণের মধ্যেই বিদ্যালয়ের সার্থকতা সীমাবদ্ধ নয়, বাঁধাধরা পরিকল্পনা পাঠক্রম ও শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে যন্ত্রের মত শিক্ষাকর্ম পরিচালনার জন্যেই বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব নয়। বিদ্যালয়ের একটি ব্যাপকতর উদ্দেশ্য আছে,

শিক্ষার একটি বৃহত্তর অর্থ আছে। বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষগুলিতে ছাত্রদের নানা ক্রিয়াকলাপের মধ্যে খেলাধূলার মাঠে, পুস্তকাগারে, ব্যায়ামাগারে পরীক্ষাগারে, ও এমনই অসংখ্য ক্ষেত্রে পারস্পরিক ভাবের আদান প্রদানের মধ্যে সাংস্কৃতিক জীবনের এমন একটি সূক্ষ্ম, দৃষ্টির অগোচর, স্বচ্ছন্দ প্রবাহ আছে যার বর্ণনা, ব্যাখ্যা বা পরিমাপ সম্ভব হয় না। মানব সভ্যতার ক্ষেত্রে এই প্রভাবের অবদান বিদ্যা ও জ্ঞানের অবদানের মধ্যে ক্রিয়া করে।

প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালয় বাস্তব সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন শুধুই একটা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ([illegible] এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। নানা জাতির, নানা ধর্মের, নানা মতের অসংখ্য ছাত্র বিদ্যালয়গুলিতে ভীড় করে আসে। বাস্তব সমাজের ভাল ও মন্দ উভয়স্তরের শিশুরাই বিদ্যালয়ে আসন পায়। শিশুরা আসে শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান, রুচিসম্পন্ন শান্তিময় পরিবার থেকে, আসে অশিক্ষিত দুর্নীতিপরাধণ, অপরাধপ্রবণ, উচ্ছৃঙ্খল অশান্তির পরিবার থেকে, আসে সম্পদশীল ও দারিদ্র্যপীড়িত উভয়প্রকার পরিবার থেকে, আসে এমন সব পরিবার থেকে যারা প্রত্যহের তুচ্ছতা ও অসাড়তার উর্দ্ধে কোনদিন উঠতে পারে নি। বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষগুলিতে প্রতিদিন হাজার হাজার শিক্ষক সমাজের বিভিন্ন ও বিচিত্র স্তরের বিভিন্ন মনোবৃত্তিসম্পন্ন হাজার হাজার শিশুর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সম্বন্ধে শিক্ষকের যতখানি অভিজ্ঞতা হয় এমন বোধ হয় কোন বৃত্তিধারী মানুষের হয় না। সামাজিক ত্রুটি বিচ্যুতি ও ব্যক্তিগত বা পরিবারগত আচরণ-বৈশিষ্ট্যের ফলে সৃষ্ট যে সব অস্বাভাবিকতা ও দুর্নীতিপরায়ণতা প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন সামাজিক স্তরের শিশুরা বিদ্যালয়ে আসে তার সঙ্গে শিক্ষকের প্রত্যহ কঠোর সংগ্রাম করতে হয়। সেগুলিকে দূরীভূত করে সামাজিক ঐতিহ্যের যা কিছু শ্রেষ্ঠ, স্থায়ী ও মহৎ ও সুকুমার সেই সব মহামূল্য বৈশিষ্ঠ্যকে বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক জীবনে সঞ্চালিত করা শিক্ষকদের মহৎ কর্তব্য। বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক জীবন ও পরিবেশ জাতির অমূল্য সম্পদ।

রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন এক আদর্শ বিদ্যালয়-সমাজের দৃষ্টান্ত। তিনি জীবনের আনন্দময় উৎসে শিক্ষার মূল নিহিত দেখে সেই নীতিতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে নিজস্ব এক সমাজ শিক্ষালয় সৃষ্টি করেন। দার্শনিক জন ডিউই ও কার্শেনষ্টাইনারের মতবাদ এবিষয়ে একটু আলোচনা মন্দ নয়। ডিউই বলেছেন—

"The School is Primarily a social institution. The school

must represent life--life as real and vital to the child as that he carries on in the home, in playground."

অর্থাৎ বিদ্যালয় সমাজেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ, সমাজের রূপের প্রতিচ্ছবি যেন বিদ্যালয়ে ফুটে উটে। সুতরাং আশেপাশের জীবনের বাস্তব বিষয় শিক্ষাকে সার্থক ও আকর্ষণীয় করে তুলবে। কিন্তু বাস্তব জীবনের বিষয় সমূহ সীমাহীন বলে তাদের সার সংগ্রহ করে স্কুলেব শিক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। জার্মানীর শিক্ষা ব্যবস্থায় তাই ভিয়েনার অধ্যাপক কার্শেনষ্টাইনারের "কুলতুরকুণ্ডে" অর্থাৎ একই পিরিয়ডে সামগ্রিক জীবনের অনুকরণে একাধিক বিষয় সন্নিবেশ প্রণালী অনুসৃত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা চলে জার্মাণ-উপকূলও ব্রিটিশ উপকূলে মৎস্য চাষের তুলনামূলক আলোচনা চার্টও ছবির সাহায্যে শিক্ষা পারিপার্শ্বিক সমাজজীবন সম্বন্ধে ধারণা দেয়। এরূপ শিক্ষা জাতীয় চেতনা উদ্বোধনেও অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে অনেক পরিমাণে সাহায্য করে। সোভিয়েৎ শিক্ষা ব্যবস্থাও রাষ্ট্রীয় লক্ষ্যের দ্বারা আগাগোড়া নিয়ন্ত্রিত হলেও জন ডিউইর প্রজেক্ট প্রণালীর বাস্তব সংস্পর্শে জীবন লাভ করেছে। প্রকৃত শিক্ষার বৃহত্তর ক্ষেত্র হল মনুষ্যসমাজ। ইংলণ্ডের পাবলিক স্কুলের ছেলেরা তাই বাইরের নগর ও পল্লী অঞ্চলের জীবনযাত্রার সঙ্গে নানা ভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পায়। তারা হাতের কাজের সময় কামারশালায় লাঙ্গলের ফাল তৈরী করে বিক্রয় করে এবং ঘোড়া ও গরুর নাল তৈয়ার করে দেয়। শান্তিনিকেতনের ছেলেরাও অনুরূপ ভাবে রবীন্দ্রনাথের সময়ে বিশ্বভারতীর গণ্ডী ছাড়িয়ে বাহিরের ব্যাপ্ত পল্লী-জীবনের সুখদুঃখের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে দিয়েছিল। এই শিক্ষা অলক্ষ্যে অবদান ছাড়াও জীবনের পারস্পরিক নির্ভর শীলতাকে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে।

Q. 8. **"The most original minds find themselves only in playing the sedulous ape to others who have gone before them along the same path of self-assertion."**

Ans. Paper II ১৬৭ পৃষ্ঠার শেষ প্যারাগ্রাফ হতে দ্রষ্টব্য।

Paper I—1962

1. Q. Education has been used in wide sense as well as in narrow sense. Explain the two uses of the word education.

Ans. 'শিক্ষা' শব্দটির সঙ্গে মানুষ বোধ হয় সবচেয়ে বেশী পরিচিত। বাল্যকাল থেকেই আমরা এই কথাটি শুনে থাকি, কিন্তু তবুও আমাদের জীবনে এর বহু বিচিত্র রহস্যের সম্পর্কে দ্বারোদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি। বস্তুতঃ শিক্ষা জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং জীবনে শেখার শেষ নেই।

এ জগতে মানুষের আবির্ভাবের পর কত শত যুগ কেটে গিয়েছে, ইতিহাস তার কোনও সংবাদ রাখেনি। অনুমান এবং কল্পনার ওপর নির্ভর করে আমরা অতীতের যে চিত্র আমাদের সম্মুখে মেলে ধরেছি, তাতে দেখতে পাই, আদিম অরণ্যচারী গুহাবাসী মানুষ তার জৈব প্রয়োজনটুকু মেটাতেই ব্যস্ত ছিল। তার বাইরে তাদের ক্রিয়াকলাপ বিস্তৃত হয়নি। অরণ্য পশু হনন করে তারা তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করত। তখনও শিক্ষা ছিল নিশ্চয়ই। তারা পশু শিকার করতে শিখেছে, শিখেছে আত্মরক্ষা করতে। কিন্তু যেদিন মানুষ বনমধ্যে ভ্রমণ করতে করতে লতা থেকে একটি কুসুম চয়ন করে আপনার মাথায় দিল, আঘ্রাণে চুম্বনে স্পর্শে তার রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ অনুভব করতে চাইল, সেদিন সে তার জৈবিক সত্বার উর্ধ্বে আর একটি সত্বার অস্তিত্ব অনুভব করল, সে হ'ল তার আত্মিক সত্বা। প্রয়োজনাতীত প্রয়োজনের সন্ধান সেদিন থেকেই তার অন্তরকে করে তুলল সৃজন ধর্মী। তাই তার জীবন যাত্রায় এল জটিলতা। ক্রমে সভ্য মানুষ গড়ে তুলল সহর। তাদের তৃপ্তিবিহীন আকাঙ্ক্ষা নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভাকে করেছে বিকশিত।

শিক্ষার প্রকৃত উৎস কি? আমাদের মনে রাখতে হ'বে, শিক্ষার প্রকৃত উৎস হ'ল দেহ ও মন। সুতরাং উভয়কে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠবে শিক্ষাধারা। যদি কেবল জৈবিক অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্যই আমরা শিক্ষালাভ করতে চাই, তবে প্রকৃত শিক্ষালাভ করতে পারব না। শিক্ষার ক্ষেত্র ব্যাপক এবং মানুষের মনও সম্প্রসারণশীল বা গতিশীল। শিক্ষা কৃত্রিম নয়, জীবনের সঙ্গে তাকে সামঞ্জস্য বিধান করে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক করে তুলতে হ'বে। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলে শিশুর মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করতে পারে না। তাই শিশুর

মন যখন ডানা মেল্‌তে শিখেছে, তখন থেকেই তাকে কল্পনার পাখা মেল্‌তে দিতে হ'বে, তার শিক্ষাকে স্বাভাবিক করে তুলতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে শিক্ষা বল্‌তে কেবল স্কুল কলেজের শিক্ষাই বোঝায় না। শিক্ষার ক্ষেত্র বিস্তৃত। তাই শিক্ষাব্যবস্থাকে কেবল স্কুল কলেজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখ্‌লে শিক্ষার্থীকে বঞ্চনাই করা হ'বে। জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই শিশু শেখ্‌বার বিষয় খুঁজে নেবে। তার ব্যবহারিক জীবনের এই অভিজ্ঞতাই তার জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলবে। শিশুর স্বাধীনতা খর্ব করে, তাকে কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয় কণ্ঠস্থ বা আয়ত্ত করাবার প্রয়াস নেওয়া হাস্যকর প্রয়াস মাত্র।

আলোচনা এতদূর অগ্রসর হবার পরে শিক্ষাকে তিনভাগে ভাগ করে আলোচনা করলে শিক্ষার স্বরূপ বুঝতে আমাদের সুবিধা হবে—যথা

(১) স্বাভাবিক শিক্ষা, (২) ব্যক্তি বা সমাজ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা, ও (৩) ব্যবহারিক শিক্ষা।

স্বাভাবিক শিক্ষা বা নিসর্গ শিক্ষা :—যে শিক্ষা দ্বারা শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পূর্ণ ও সুশৃঙ্খল বিকাশ সাধন হয়, ইন্দ্রিয় নিচয় দক্ষ, শক্তিশালী ও কার্যক্ষম হয়ে ওঠে, বিভিন্ন মনোবৃত্তির সর্বাঙ্গীন স্ফূরণ হয়, এবং স্মৃতি, প্রজ্ঞা, মেধা, স্থৈর্য, যুক্তি প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি নিচয় কুশল ও প্রখর হয়, সেই শিক্ষাকেই স্বাভাবিক শিক্ষা বলা হয়। অর্থাৎ মানুষের অন্তর্নিহিত বৃত্তি নিচয়ের শিক্ষাকে স্বাভাবিক শিক্ষার অন্তর্ভূক্ত করা যায়। ভাষান্তরে বলা যায় স্বাভাবিক শিক্ষার দ্বারাই মানুষের শারীরিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক বা আত্মিক বিকাশ ঘটে। একেই শিক্ষাব্রতীগণ বলেছেন বিকাশ বা বৃদ্ধি বা উন্নয়ন (Development)।

ব্যক্তিশিক্ষা বা সমাজ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা :—কার্যগত অভিজ্ঞতার দৃষ্টিতে স্বাভাবিক শিক্ষালব্ধ বিকশিত বৃত্তিনিচয় কি ভাবে বহির্জগতে কাজে লাগান যায় সেই সম্পর্কে শিক্ষকগণ যে মৌখিক ও প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাদেন সে শিক্ষাকে ব্যক্তি শিক্ষা বলা যায়।

ব্যবহারিক শিক্ষা :—প্রকৃতিতে ও সমাজে মনুষ যে স্থান লাভ করে এবং কর্ম মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এসব বাহ্যবস্তুর বা ভৌতিক জ্ঞানকে ব্যবহারিক শিক্ষা বলা যায়।

ব্যক্তিশিক্ষা এবং ব্যবহারিক শিক্ষা উভয়ের উৎস বহির্জগৎ। শুধু নিসর্গ শিক্ষা অন্তর হতে লাভ করা যায়।

কাজেই শিক্ষাকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা বাঞ্ছনীয় (১) অন্তঃশিক্ষা ও

(২) বহিঃশিক্ষা। এ দৃষ্টিকে আরও একটু এগিয়ে নিয়ে একথা বলা যেতে পারে যে, বাহ্য বা বহিঃশিক্ষা অভাবাত্মক এবং অন্তঃ বা ভিতরের শিক্ষা ভাবাত্মক অর্থাৎ যা আছে তার বিকাশ। সুতরাং শিক্ষার তাত্ত্বিক সংজ্ঞা হচ্ছে ভিতরের শিক্ষা বা বিকাশ।

অনন্ত বিশ্বে বাহ্য শিক্ষার অবিরল উৎস বিরাজমান। কেবল মাত্র শিক্ষকের কাছেই মানুষ বাহ্য শিক্ষা লাভ করেনা। প্রকৃতপক্ষে এ অনন্ত বিশ্বের প্রত্যেক বস্তু থেকেই মানুষ শিক্ষা লাভ করছে। মৃত্তিকা, প্রস্তর রাজি, বৃক্ষসমূহ, কুসুমসম্ভার, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, আকাশ, বায়ু, নক্ষত্ররাজি প্রভৃতি এ অনন্ত বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুই মানুষকে অবিরত ধারায় শিক্ষা দিতেছে। নৈয়ায়িকদের অণু থেকে সাংখ্যের মহৎ তত্ত্ব পর্যন্ত, জ্যামিতির বিন্দু থেকে ভূগোলের সিন্ধু পর্যন্ত সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ বস্তুই গুরুরূপে আমাদের শিক্ষা দান করে। এ সম্পর্কে শেক্সপীয়ার বলেছেন—"প্রহমানা স্রোতস্বিনীর মধ্যে স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় রচিত গ্রন্থ লুকানো রয়েছে, প্রস্তর রাজিতে দর্শনিক শাস্ত্র লুকানো রয়েছে আর বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে শিক্ষার সমগ্র তত্ত্ব নিহিত রয়েছে।" সুতরাং বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিকের দূরবীণে, কুশলী ব্যক্তির চর্ম চক্ষুতে, কল্পনা কুশল কবির দিব্যদৃষ্টিতে অথবা যুক্তিবাদী তত্ত্বজ্ঞানীর জ্ঞান চক্ষুতে যে সকল পদার্থ প্রতিভাত হয় কিম্বা অপ্রতিভাত থেকে যায় সে সব থেকেই মানুষ অবিরত শিক্ষা লাভ করে। সার্বজনীন শিক্ষার জন্য বিশাল সৃষ্টিরূপ এক শাশ্বত, দিব্য, পরমাশ্চর্য ও পবিত্র গ্রন্থ উন্মুক্ত রয়েছে।

এ বিস্ময়কর গ্রন্থের সামনে মানুষের সৃষ্ট জ্ঞান-বিজ্ঞান কত নিরর্থক ও নির্বল। এখন প্রশ্ন ওঠে যে মানুষ প্রকৃতির এই শাশ্বত, দিব্য, ও বিস্ময়কর গ্রন্থ থেকে কিরূপে শিক্ষালাভ করে। এ বিষয়ে প্রত্যেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি জানেন যে এ প্রকৃতি গ্রন্থ যতই গভীর হোক না কেন মানুষ আপন পাত্র অনুসারেই তা থেকে শিক্ষালাভ করতে পারবে। আরও একটু সম্প্রসারিত করে বলা যায় যে প্রতিটি মানুষের ভিতরে যে জাতীয় ও যে পরিমাণ শিক্ষালাভের ক্ষমতা থাকে সেই জাতীয় ও সেই পরিমাণ শিক্ষাই তারা বহির্বিশ্ব থেকে আহরণ করতে সমর্থ।

এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবার পরে মানুষ তার জীবনে কত বই পড়ে, কত [illegible], কত যুক্তিতর্ক শুনে এবং কত বস্তু দেখে। কিন্তু এ সকল হতে তাদের [illegible] কতটুকু উদ্ভাসিত হয়? মোটকথা বাহ্য জগৎ হতে গৃহীত বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সবই তাদের মনে থাকেনা, কেবল মাত্র বিচিত্র অনুভূতি হতে উদ্ভূত

সংস্কারগুলো বাকী থেকে যায়, অর্থাৎ শিক্ষা অথবা বিষয় জ্ঞান ক্রমে ক্রমে সংস্কারে বা সহজ জ্ঞানে পরিণত হয়ে যায়। এ বিষয়ে পূর্বেই বলা হয়েছে যে মানুষের ভিতরে যার সম্ভবনা নেই, বাহির থেকে তাকে লাভ করা অসম্ভব। সুতরাং একথা বলা যায় যে বাহ্য শিক্ষা অভাবাত্মক, এ শিক্ষা কোন নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র তাত্ত্বিক বস্তু নয়।

আলোচনা এতদূর অগ্রসর হবার পরে স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন ওঠে যে নিসর্গ শিক্ষা বা ভিতরের শিক্ষা এবং বাহ্য শিক্ষার সম্বন্ধ কি? এরূপ দার্শনিক তত্ত্ব বিচার ক্ষেত্রে সাধারণতঃ কূট-সমস্যার (Dilemma) উদ্ভব ঘটে। এক্ষেত্রে যদি ধরা যায় যে বাহ্য শিক্ষার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই তাহলেও সত্যসংস্কার গঠনের জন্যে বাহ্য নিমিত্তের প্রয়োজনীয়তাও কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। অপর পক্ষে বাহ্য শিক্ষার বাস্তব স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলে দেখা যাবে যে, অন্তর্বিকাশজাত সহজ জ্ঞান কেবল মাত্র ভিতরের তাত্ত্বিক বস্তুর বিকশিত অবস্থা মাত্র নয়, বাহ্য শিক্ষারূপ সত্য বস্তু ও সেই সহজ জ্ঞানের অংশ রূপে বর্তমান থাকে। অর্থাৎ এতে দুপক্ষে কূট-সমস্যা সিদ্ধ হচ্ছে—অস্তিত্ব না থাকলেও অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে এবং অস্তিত্ব থাকলে বাহ্য বস্তুও সহজ জ্ঞানের অংশ বলে সিদ্ধ হচ্ছে। সুতরাং এক অসম্ভব সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হচ্ছে। কিন্তু এরূপ দার্শনিক বাদ-প্রতিবাদ কোন নূতন কথা নয় এবং এরূপ বিপরীত সিদ্ধান্ত ও নূতন নয়। এরূপ বাদ-প্রতিবাদ ও এরূপ সিদ্ধান্ত সকল দার্শনিক বিচারেই দেখতে পাওয়া যায়। যেমন দুঃখের সঙ্গে বাহ্যবস্তুর কি সম্বন্ধ? এ প্রশ্নের বৈদান্তিক বাদ-প্রতিবাদ সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাক্। এখানেও উপরোক্ত প্যাঁচ রয়েছে। যদি ধরা যায় বাহ্যবস্তুর মধ্যে সুখের অস্তিত্ব রয়েছে তাহলে সুখকর বস্তুতে সর্বদাই সুখ হওয়া উচিত। কিন্তু সর্বদা তা হয় না। যেমন মানসিক অবসাদের সময় সুখকর বস্তুতে সুখানুভূতি হয় না। অপর পক্ষে যদি ধরা যায় বাহ্যবস্তুতে সুখের অস্তিত্ব থাকেনা—সুখ হল মনের বস্তু নিরপেক্ষ অনুভূতি মাত্র, তাহলেও দেখা যাবে যে এ অনুভূতি বস্তুর অভাবেও হয় না। একথা কঠোর সত্য। যেমন সত্যিকারের ঘোড়া ছাড়া ঘোড়ায় চড়ার সুখ পাওয়া সম্ভব নয়। তাহলে এ ধরণের কূট প্রশ্নের প্রকৃত সমাধানের উপায় কি? ন্যায় শাস্ত্রের আর একটি উদাহরণ ধরা যাক্। মাটিও ঘটের সম্বন্ধ কি? যদি ধরা যায় মাটি ও যা ঘট ও তাই, তাহলে ঘটে যেমন জল ভরা যায় মাটিতেও তেমনি জল ভরা যাবে। আর যদি ধরা যায় মাটি ও ঘট ভিন্ন-ভিন্ন বস্তু তাহলে বলা যায় মাটি ও ঘটকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করা

সম্ভব। এঅবস্থায় প্রশ্ন হল এদুটি বস্তুর সম্বন্ধ নিরূপণের। এসম্বন্ধের রুচি সম্মত সর্বজন স্বীকৃত ও মার্জিত নাম দেওয়া হয়েছে 'অনির্বচনীয় সম্বন্ধ।' কিন্তু এরূপ সম্বন্ধ নির্ণয় করা সত্ত্বেও একপক্ষ যেমন তুলনামূলক ভাবে বলেন—'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্—' অর্থাৎ মাটিই সত্য ঘট মিথ্যা তেমনি তুলনামূলক ভাবে বলা যায় অন্তঃ শিক্ষা ভাবাত্মক কার্য আর বাহ্য শিক্ষা আভাবাত্মক কার্য।

কিন্তু এর পরেও আর একটি এমন প্রশ্ন থেকে যায় যা পূর্ব্ববর্ণিত সকল সমাধানই ব্যর্থ করে দেয়। আমরা শিক্ষাকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছি, যথা—অন্তঃ শিক্ষা ও বাহ্য শিক্ষা। এদুটি শিক্ষার মধ্যে অন্তঃ শিক্ষা বা আত্মিক বিকাশ নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বস্তু সন্দেহ নেই, এবং এবস্তু প্রতিটি মানুষের অন্তরে বর্তমান থাকে। এ-কারণে বিকাশের ব্যাপারে বাহির থেকে কিছুই করবার নেই।

অপরপক্ষে সমষ্টি গতভাবে বাহ্য শিক্ষা এবং ব্যক্তিগত ভাবে ব্যক্তি-শিক্ষা উভয়েই অভাবাত্মক—এ সিদ্ধান্তে আমরা পূর্ব্বেই উপনীত হয়েছি।

এ যুক্তি অনুসারে সমগ্র শিক্ষা বিষয়ক প্রচেষ্টাই মূর্খতা নয় কি? বাহ্যতঃ একাতরোক্তি যতটা নিরুত্তরণীয় ও অভ্রান্ত বোধ হচ্ছে, বস্তুতঃ তা নয়। কারণ, যখন বলা হয় বাহ্য শিক্ষা অভাবাত্মক তখন একথার তাৎপর্য এই নয় যে, এটা কোন কাজই নয়। প্রকৃতপক্ষে বাহ্য-শিক্ষা একটি কাজ এবং আতপ্রয়োজনীয় কাজ, তবে এটি অভাবাত্মক কাজ—অভাবাত্মক বলার প্রকৃত অর্থ এই—অন্তরের মধ্যে যে ভাব নেই, যে বৃত্তি নেই সে সকলের উদয় করা শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। পক্ষান্তরে সুপ্ত সম্ভাবনাকে জাগ্রত ও বিকশিত করাই শিক্ষা। কিন্তু অধিকাংশ লোকে শিক্ষা সম্বন্ধে যে ধারণা রাখে, আসলে শিক্ষার উপযোগিতা তা নয়। তাই বলে শিক্ষা অবশ্য অপ্রোয়জনীয় হয়ে যায় না। এ বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট করবার জন্যে একটি উদাহরণ ধরা যাক্—যেমন—উগ্রসমাজ সংস্কারকের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের কাছে সমাজসেবী মনিষী কার্বের বিধবা বিবাহ প্রতিবন্ধক নিবারণ—প্রচেষ্টা বিধবা বিবাহ প্রচলনের পক্ষে নিতান্তই অনুপযুক্ত প্রচেষ্টা বলে প্রতিয়মান হলেও বাস্তবিক কার্বের প্রচেষ্টাই যে সমধিক উপযোগী, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। শিক্ষা উত্তেজক ঔষধের সঙ্গে তুলনীয় নয়, শিক্ষার কাজ হচ্ছে বাধাদূর করা।

রাসকিন শিল্প ও কলা সম্বন্ধে অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। শিল্পীকে

মৃত্তিকা বা প্রস্তর থেকে মূর্তি তৈরী করতে হয় না, কারণ মূর্তি প্রস্তর বা মৃত্তিকায় সম্ভাবনা রূপে সুপ্ত থাকে। নিহিত মূর্তিকে প্রকট করে রূপ দেওয়াই শিল্পীর কাজ। সুতরাং একথা বলা যায় যে বাহ্য শিক্ষা কার্য অভাবাত্মক হলেও একটি প্রয়োজনীয় কাজ। ইহা প্রতিবন্ধক-নিবারণের দ্বারা আত্মবিকাসের সহায়তা করে বলে বাহ্য-শিক্ষার সামান্য ভাবাত্মকতাও উদ্ভব ঘটে। এদৃষ্টি থেকেই বলা হয়ে থাকে যে, শিক্ষা কার্য তুলনামুলক ভাবে আভাবাত্মক।

Q. 2. "Educational efforts must be limited to securing for every one the conditions under which individuality is most completely developed." Do you agree ? Give reassons for your answer.

Ans. ১৯৫১ সালের Paper I ১নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

Q. 3. Estimate the importance of heredity and environment in education.

Ans. ১৯৫৩ সালের Paper I ৭নং প্রশ্নের সংশ্লিষ্ট অংশ দ্রষ্টব্য।

Q. 4. "The teacher has more than average need for abundant optimism to meet discouraging situations and for good sense of humour and of proportion to relieve tensions and misunder standings". Discuss.

Ans. ১৯৫০ সালের Paper I ২নং প্রশ্নের দ্রষ্টব্য।

Q. 5. Describe briefly the physical and mental characteristics of a child in the pre-adolescence period. How you give him the best possible training at this stage ?

Ans. Paper II ২৬নং প্রশ্ন (১৮৮ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

Q. 6. The ideal of the true educator is to create "a common wealth in which work is play and play in life, three in one and one in three." Elucidate.

Ans. Paper II (b) নং প্রশ্ন (পৃঃ ১৫৬) দ্রষ্টব্য।

Q. 7. Discuss the public school idea. What are your views regarding the foundation of public schools of the English type in this country.

ইংলণ্ডের পাবলিক স্কুল সম্বন্ধে ১৯৫২ সালের Paper III ৮ (c)নং প্রশ্ন ও ১৯৬১ সালের ৪নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

উপরের আলোচনাতে ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থায় পাবলিক স্কুল সমূহের ভূমিকা পরিস্ফুট। ইংলণ্ডের ন্যায় ভারতবর্ষেও ইংরেজ আমলে অভিজাত সম্প্রদায় ও রাজন্যবর্গের ছেলেদের শিক্ষার জন্য কয়েকটি পাবলিক স্কুল বা রাষ্ট্রবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এ সব স্কুলের ব্যয় নির্বাহ হয় রাজকোষ হতে। ভারতের পাবলিক স্কুলগুলি ইংলণ্ডের পাবলিক স্কুলের ন্যায় আভিজাত্যে ও কৌলিন্যে কোন দিনই শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠতে পারেনি।

ভারতীয় পাবলিক স্কুল সম্পর্কে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সব মন্তব্যে কতগুলি মূল্যবান সুপারিশ সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে বর্তমানে ভারতবর্ষে এই প্রকারের স্কুলের বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

Q. 8. The school should be an idealized epitom or model of the world, not merely the world of ordineery affirs, but the whole of humanity, body, soul Past Present and Future. Discuss.

Ans. ১৯৫৯ সালেষ Paper I ৭ (c) এবং ৬নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

Second Paper—1961

Q. 1. (a) Why is Educational Psychology included in every teacher training course ?

b) Cite at least one instance when you found your knowledge of psychology useful during your practice teaching period.

Ans. Add from Paper II Q. 1. from the beginning......

প্রায় দেড়শ বছর.......upto এই সব বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানই হল শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান (Educational Psychology) on page 2.

আধুনিক কালে মনস্তত্ত্ব আচরণতত্ত্বে পরিণত হয়েছে। Woodworth-এর ভাষায়, "মনোবিজ্ঞান প্রথম তার আত্মাকে হারিয়েছে, তারপর হারিয়েছে তার মনকে, শেষ পর্যন্ত তার চৈতন্যকেও হারিয়ে অবশেষে রেখেছে শুধু এক ধরণের আচরণ।" মনস্তত্ত্ব এই আচরণতত্ত্বে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেস্‌টালৎসীর শিক্ষা-ব্যবস্থাকে মনোবিজ্ঞান-সম্মত করার প্রস্তাবটি কাজে পরিণত হয়েছে। শিশুর মন কোন্ পরিবেশে কি আচরণ করে, শিক্ষক তা লক্ষ্য কোরে তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি স্থির কোরতে পারেন, শিশুর আচরণগুলিকে বাঞ্ছনীয় আকার দিতে পারেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তিনটী প্রধান কথা আমাদের মনে রাখতেই হবে, আর এই তিনটে ক্ষেত্রেই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান আমাদের প্রধান সহায়। বিষয় তিনটী হোলো :—

(১) শিশুদের ও তাদের প্রকৃতিকে বুঝতে হবে ;

(২) শিক্ষক নিজেকে বুঝবেন নিজের প্রকৃতি এবং আচরণের গুরুত্ব তাঁর অনুধাবন করা একান্ত প্রয়োজন ; এবং

(৩) শিশুদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে ও তাদের সাথে সাধারণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিক্ষক কী পথ এবং পদ্ধতি অবলম্বন কোরবেন, তা নির্ণয় করা। এই তিনটী বিষয়ের ক্ষেত্রেই মনোবিজ্ঞানের সাহায্য অসীম গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষাক্ষেত্রে সম্পর্ক নির্ণয় কোরতে গেলেও দেখা যায় এখানে তিন প্রকার সম্পর্ক বিরাজ কোরছে। সম্পর্ক তিনটী হচ্ছে, (১) শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সম্পর্ক, (২) শিক্ষার্থী ও সমাজের সম্পর্ক এবং

(৩) শিক্ষার্থী ও শিক্ষণীয় বিষয়ের সম্পর্ক। এই সম্পর্কগুলির উপযুক্ত

বিচার এবং সদ্ব্যবহারের জন্যও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান একেবারে অপরিহার্য।

উপরে শিক্ষাক্ষেত্রে যে তিনটী প্রধান দিক এবং যে তিনটী প্রধান সম্পর্কের কথা বলা হোলো, বুঝতে হোলে বা কাজে লাগাতে হলে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান আমাদের কিভাবে সাহায্য কোরতে পারে, তা' নিম্নলিখিত বর্ণনার সাহায্যে সুস্পষ্ট করা যেতে পারে :—

(১) মনোবিজ্ঞান শিক্ষককে বলে দেয় যে, শিশুর কতকগুলি অন্তর্নিহিত সহজাত ক্ষমতা ও সংস্কার আছে। Add here from Paper II. page 5 upto the end of the answer.......শিক্ষা বিজ্ঞানের উপকরণ যোগায় on page 6).

Q. 2. (a) In whal respects do children in a class differ from one another ? (b) In what respects are they similar ? (c) Discuss some of their educational implications.

শিশুদের ব্যক্তিগত পার্থক্য

Ans. (a) বিদ্যালয়ের প্রতিটী শ্রেণীতে আমরা কতকগুলি ছাত্রকে (সাধারণতঃ ৩০ থেকে ৫০ জন) একসাথে শিক্ষা দিয়ে থাকি। এই শিক্ষা কোন্ দিক দিয়ে কিভাবে ফলপ্রসূ বা নিষ্ফল হয়, তা অবশ্যই বিচার ক'রে দেখা দরকার। আর সেক্ষেত্রে সকলের আগে শিশুদের ব্যক্তিগত পার্থক্যের সমস্যাটা বিচার করা প্রয়োজন।

[Add from Paper II page 77 (paper II), separate para.
গোষ্ঠীগত ভাবে একটি শিশুর সঙ্গে আর একটি শিশুর বিশেষ প্রভেদ......
Upto page 80—সাধারণ বুদ্ধির পরিমাণ সব শিশুর সমান নয়। বুদ্ধির এই বিভিন্নতাও মানুষের বংশক্রম ও দেহমনের জটিলতা থেকেই আসে।]

(b) আমরা দেখেছি মানুষে মানুষে ব্যক্তিগত পার্থক্যটাকে শ্রেণীভিত্তিক করার চেষ্টা অর্থাৎ বিভিন্ন টাইপে মানুষগুলোকে ভাগ করার চেষ্টা অনেক কাল থেকেই চলে আসছে। মধ্যযুগীয় পণ্ডিতদের ক্রোধশীল (choleric), জড় প্রকৃতি (phlegmatic), বিষাদশীল (melancholic) এবং আশাবাদী (sanguine) মানুষের শ্রেণীবিভাগের কথা এবং য়্যুঙ্গের অন্তর্বৃত্ত এবং বহির্বৃত্ত মানুষের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ কোরেছি। এইভাবে মানুষের শ্রেণী বিভাগের দ্বারা ব্যক্তিগত পার্থক্যের দুস্তর সমুদ্রকে সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা

হয় এবং এক একদল মানব-সমষ্টিকে নিয়ে এক এক প্রকার কাজে প্রবৃত্ত করার চেষ্টা হয়। কিন্তু এই টাইপ মতবাদের মস্তবড় অসুবিধে এই যে, দুই প্রান্তের দুই চরম নিদর্শনকেই দুটো বিভিন্ন বিপরীতমুখী টাইপ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়—যেমন য়্যুঙ্গের অন্তর্বৃত্তের দল; কিন্তু মাঝে থাকে এমন অসংখ্য লোক—আর তারাই সবসময়ে দলে ভারী—যারা পরিষ্কারভাবে কোনো নির্দিষ্ট টাইপের আওতায় আসে না। বস্তুতঃ জীবন্ত, ক্রিয়াশীল এবং সতত পরিবর্তনশীল মানুষকে কোনো নির্দিষ্ট টাইপে ভাগ করতে যাওয়ার বিপদ অনেক; একটা টাইপের উল্লেখ কোরলে আমরা কোনো মানুষের চরিত্রের প্রধান ঝোঁকটা জানতে পারি মাত্র; কিন্তু সেই ঝোঁকটাও অহরহ নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সংশোধিত ও পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। আসল কথা, ব্যক্তিগত পার্থক্যের মাত্রা ও ধরণটা জন থেকে জনান্তরে ধীরে ধীরে মিলে-মিশে গেছে এবং একমাত্র দুই প্রান্তের দুই চরম নিদর্শনই আমাদের মনকে বিশেষভাবে বিচলিত কোরে তোলে। অর্থাৎ, যেভাবেই দেখা যাক মাঝারি মিশ্রধরণের মানুষই এই জগৎ-সংসারে [illegible]ধিক; বিদ্যালয়ের প্রতি শ্রেণীতেও এই ধরণের শিশুরাই সংখ্যাধিক। তাই বর্তমানে বিভিন্ন টাইপ-ভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাধারার কথা নয়; এই মাঝারি শ্রেণীর শিশুদের লক্ষ্য কোরেই শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষাদানের সমস্যার সমাধানের চেষ্টা হয়ে থাকে। থর্নডাইক বলেন মানুষে মানুষে বৈষম্যগুলি এতই ক্রমিক ও ধারাবাহিক যে তাদের কতকগুলো নির্দিষ্ট গণ্ডার মধ্যে ভাগ কোরে ফেলা যায় না। তিনি বলেন সমস্ত মানুষের মাত্র একটি শ্রেণী হচ্ছে মাঝারি শ্রেণী। দুই দিকের দুই সীমান্ত শ্রেণীভুক্ত মানুষ কদাচিৎ মেলে। মানুষে মানুষে যত বৈষম্য সবেরই ঝোঁক কেন্দ্রের দিকে অর্থাৎ মাঝামাঝি। তাহলে সিদ্ধান্ত আসতে পারে যে একটা শ্রেণীর মাঝারি শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য কোরেই শিক্ষকের শিক্ষাকর্ম অগ্রসর হবে। কিন্তু যেসব শিক্ষার্থী অতি বুদ্ধিমান তাদের অগ্রগতি এতে ব্যাহত হবে এবং অন্যদিকে যাদের বুদ্ধি প্রভৃতি মাঝারির চেয়ে কিছু কম তারা অবহেলিত হবে। বস্তুতঃ এই প্রচেষ্টার মধ্যেও বহু ফাঁক এবং গলদ রয়ে গেছে, তাই শ্রেণীসংগঠনের ভিত্তিতে ব্যক্তিগত শিক্ষাদান পদ্ধতিকেই অত্যুৎকৃষ্ট বলে স্বাগত জানানো হয়েছে। এই জন্যেই আমরা মন্তেসরীর শিক্ষাপদ্ধতি, এবং ডাল্টন পরিকল্পনা প্রভৃতিকে বর্তমানে বহু সাধুবাদ দিয়ে থাকি।

(c) আমরা পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে দেখলাম জীবন্ত মানুষের সমস্যা অনেক এবং তার শ্রেণী সংজ্ঞা নির্ণয় সহজসাধ্য নয়। শিক্ষকের কাজ হচ্ছে

জীবন্ত মানব-শিশুকে নিয়ে, তাই পরিসংখ্যান বিজ্ঞান অধিকাংশ মানুষকে মাঝারি বলে মার্কা দিয়ে দিলেও শিক্ষকের কাজ তাতে সহজ হয়ে যায় না। শিক্ষক জানেন যে অধিকাংশ শিশুই মোটামুটি মাঝারি হলেও ব্যক্তিগত যে সব ছোটো খাটো......(Add here Paper II page 109 upto 116 ডালটন্ পদ্ধতির অনুগামীরাও প্রায়ই সকল শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজন এমন কতকগুলি বিষয়ের শিক্ষা-পাঠনের মাধ্যমে দিবার প্রয়োজন বোধ করেন।

ব্যক্তিগত পার্থক্য বিবেচনা করার সময়ে সহশিক্ষার প্রশ্নটিরও উল্লেখ আবশ্যক হয়ে পড়ে। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক, সুস্পষ্ট এবং ব্যাপক প্রভেদ হোলো যৌন প্রভেদ। আর এই যৌন প্রভেদের ফলে নারী-পুরুষের প্রকৃতিতেও অনেকখানি প্রভেদ ঘটে। তাই তাদের যে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে শিক্ষা দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। পৃথকভাবে শিক্ষণীয় বিষয়গুলির সমস্যার সমাধানে মান্তসরী বা ডালটন পরিকল্পনার ব্যক্তিগত শিক্ষাদান প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে। এছাড়া বুদ্ধির অভীক্ষায় দেখা গেছে, গড় মানসিক ক্ষমতায় নারী-পুরুষে তেমন কোনো প্রভেদ নেই—তাই নারী-পুরুষের শিক্ষার ভেদ ঘটাতে হবে এমন কোনো যুক্তিও হতে পারে না। আসলে সহশিক্ষার সমস্যা একটা সামাজিক বিচার-বিবেচনার সমস্যা। স্থানীয় সমাজের সামাজিক সমস্যাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতেই সহশিক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া প্রয়োজন।

ব্যক্তিগত পার্থক্যের গুরুত্বকে মেনে নিয়েও শ্রেণীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে আরও একটি মৌলিক কারণে অস্বীকার করা যায় না বস্তুতঃ শ্রেণীশিক্ষার অন্যতম প্রধান তাৎপর্যটাও এইখানে। ব্যক্তিগত পার্থক্য বনাম শ্রেণীশিক্ষার সমস্যা আলোচনা কোরতে গিয়ে তাই এই প্রশ্নটার আলোচনা অপরিহার্য। এই আলোচনাটুকু ছাড়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার আদৌ সম্ভব নয়।

মনে রাখতে হবে, বিদ্যার্জন শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ হলেও সবখানি নয়—শিক্ষার আর একটি ব্যাপকতর অর্থ আছে।

বুদ্ধি ও মানসিক অন্যান্য ক্ষমতার দিক দিয়ে একটি শিশু অন্য আর একটি শিশু থেকে স্বতন্ত্র। Add here from paper II page 116 upto page 117—মানুষকে সকলের সঙ্গে এক হয়ে নানা বিষয় অনুভব করতে হয়, কাজ করতে হয়, তার জন্য শিক্ষা চাই।

Add from part II page 118—সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি।...upto শিক্ষার ব্যাপকতর অর্থ ও উদ্দেশ্য।

সমাজে আমরা একে অপরকে অনুকরণ কোরে চলি। বিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেণীতেও ঠিক এই অনুকরণের কাজ চলে থাকে। তাই একদিক দিয়ে বলা চলে, শ্রেণীশিক্ষাতে শিক্ষাদান কাজটা তার দুই মেরুবিন্দুর (bi-polar) কাজ না হয়ে বহু মেরুবিন্দুর (multi-polar) কাজ হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া, সাধারণ সমস্যামূলক, প্রেরণামূলক এবং রসসঞ্চারী পাঠের ক্ষেত্রে শ্রেণীশিক্ষাই প্রশস্ত বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। কারণ এই সব ক্ষেত্রে প্রতিটি শ্রেণীতে গণমনের লীলা শক্তিশালী অন্তঃস্রোত হিসাবে পরম সহায়ক হয়ে থাকে। তাই ডালটন পদ্ধতির অনুগামীরাও অনেক বিষয়েই শ্রেণীশিক্ষাকে বজায় রাখতে সমৎসুক।

অনুকরণ ত্রিবিধ। অনুভূতির অনুকরণকে বলা হয় সংবেদনশীলতা বা সহানুভূতি (sympathy); বুদ্ধির বা চিন্তার অনুকরণকে বলা যায় অভিভাবন (suggestion)। Add here from paper II page 118 upto the end of the answer on page 120—তেমনি উদারতর ও শিক্ষার জন্য শ্রেণীগত শিক্ষার প্রয়োজন।

Q. 3. What is intelligence? How can it be measured? How is the knowledge of a child's intelligence helpful to the educator?

Ans. Paper II র ২নং প্রশ্ন এবং ১৮নং প্রশ্ন পৃঃ ১৪১ দ্রষ্টব্য।

Q. 4. How do children learn? What is the difference between animal learning and human learning? Which of the various theories of learning would you support?

Ans. Paper II ৫নং প্রশ্ন ৩৭ পৃষ্ঠার তৃতীয় প্যারা হইতে শেষ পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

Q. 5. What are emotions? What can home and the school do for the proper emotional development of a child?

Ans. Paqer II এর ৩নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

Q. 6. Analyse the process involved in remembering. How would you plan your lessons so that the pupils may not easily forget what they learn.

Ans. Paper II এর ২০নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

Q. 7. What are the psychological need of on adolescent? How would you secure the attention of adolescent pupils in a lesson?

Ans. Paper II এর ১২নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

Q. 8. Write short notes on any four of the followsng :—

(a) Mimesis; (b) Gestalt; (c) I. Q; (d) Punishment (e) Concept; (f) Condilioning; (g) Complex.

Ans. Paper II এর :

(a) ১৪নং প্রশ্ন ১১৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(b) ১০ (b) নং প্রশ্ন পৃঃ ১৬৫ দ্রষ্টব্য।

(c) ২নং প্রশ্ন পৃঃ ১৫ দ্রষ্টব্য।

(f) ১৬ (f) নং প্রশ্ন পৃঃ ১৩৪ দ্রষ্টব্য।

(g) ১৬ (d) নং প্রশ্ন পৃঃ ১২৩ দ্রষ্টব্য।

Paper I এর :

(e) ১৯৫০ সালের ৫নং প্রশ্ন পৃঃ ৫৬ দ্রষ্টব্য।

(d) ১৯৫২ সালের ৫নং প্রশ্নে পৃঃ ৪২ দ্রষ্টব্য।

Paper II—1962

Q. 1. Show how knowbdge of Psychology helps us in solving the theoretical and practical problems of education.

Ans. Paper II ১নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

Q. 2. Children of a particular age or stage of development are same in some respects and are different from one another in some other respects. Illustrate this in reference to a particular age or stage of development and indicate its bearing on education.

Ans. Paper II ২৬নং প্রশ্ন পৃঃ ১৮৮ দ্রষ্টব্য।

Q. 3. What is the difference between instinctive behaviour and intelligent behaviour ? How for is childrens behaviour instinctive or other wise ?

How is knowledge of instiucts inportant to educations ?

Ans. Paper II ৯নং প্রশ্ন পৃষ্ঠা ৬৯ দ্রষ্টব্য।

Q. 4. What are intelligence tests ? How do they differ from scholastic tests ? Discuss their respective functions with illustrastions.

Ans. Paper II ২নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

বুদ্ধি পরীক্ষাও কৃতিত্ব বা অর্জিত বিদ্যার পরীক্ষা (Scholastic Test) এক নয়। বুদ্ধি জন্মগত, কিন্তু কৃতিত্ব বা বিদ্যা পরে বুদ্ধি অনুপাতে ব্যক্তি কর্তৃক অর্জিত জিনিস। বুদ্ধি নির্ভর করে উল্লম্ব মানসিক বিকাশের ওপরে, আর কৃতিত্ব বা বিদ্যা নির্ভর করে ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ওপরে। কৃতিত্বের পরিমাপদ্বারা জন্মগত বুদ্ধির পরিমাপ হয় না। কৃতিত্বের পরিমাপ করার সূত্র হচ্ছে :

$$\text{কৃতিত্ব অঙ্ক (A. Q)} = \frac{\text{শিক্ষা বয়স (Educationalage)}}{\text{মনো বয়স (Mentalage)}} \times ১০০।$$

এর পর Paper II ১৮ প্রশ্ন পৃঃ ১৭১ দ্রষ্টব্য।

Q. 5. What is ment by learning ? How is it related to maturation ? Discuss some of the conditions of effective learning.

Ans. Paper II ১৬ (f) নং প্রশ্ন, ১০ (d) নং প্রশ্ন (পৃঃ ১৭১) এবং ৪ (e) নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য। সবশেষে Paper II ২৭নং প্রশ্ন (পৃঃ ১৯০) দেখুন।

Q. 6. Discuss the relation between interest and attention. What are differentkinds of attention ? Is volitional attention possible without interest ?

Ans. Paper II ১৯ নং প্রশ্ন (পৃঃ ১১১) সংশ্লিষ্ট অংশ দ্রষ্টব্য।

Q. 7. What are habits ? Discuss the laws of habit formation. Is character a bundle of habits ?

Ans. Paper II ৫নং প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট অংশ দ্রষ্টব্য।

Q. 8. What do yot understand by 'transfer of training ? How can good teaching facilitate Transfer ?

Ans. Paper II ৮ (c) নং প্রশ্ন (পৃঃ ৬১) দ্রষ্টব্য।

Q. 9. Write short notes on any four of the following :—

(i) Perception ; (ii) temperament ; (iii) the unconseious ; (iv) make-believe play ; (v) the learning curvc ; (vi) imagination ; (vii) suggestion.

Ans. (i) ইন্দ্রিয়ের দ্বার পথে প্রতিদিনই আমরা নানা অভিজ্ঞতা অর্জন করি। বহির্জগতের ও দেহাভ্যন্তরের সমস্ত সংবাদই ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমাদের মস্তিষ্কে গিয়ে প্রথমে সংবেদন বা প্রাথমিক জ্ঞান জন্মায়, এবং তার পরে আমাদের মনে বোধ জন্মে। বস্তুগত যে বোধ তাকেই প্রত্যক্ষজ্ঞান (perception) বলে। এ বিষয়ে একটা উদাহরণ দিলেই ভাল বুঝা যাবে। যেমন ঢং ঢং ঢং করে ঘণ্টার শব্দ বায়ুতরঙ্গে ভেসে এসে আঘাত করল কর্ণপটাহে এবং স্নায়ুতে গিয়ে পৌছল এবং শব্দগুলো শোনা গেল—এহোল সংবেদন। কিন্তু যখন এই ঢং ঢং শব্দ শুনে বলা হোল—বাড়ীর ২০০ গজ দূরে কলেজের ঘণ্টা বাজছে—তখন এই পূর্ণতর জ্ঞানকে বলে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান। এই বোধ বা প্রত্যক্ষজ্ঞানের পরিমাণ ও অনুপাত নির্ভর করে উত্তেজকের পরিমাণ ও অনুপাতের ওপর।

প্রাথমিক ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রাথমিক মৌলিকবোধ, প্রত্যক্ষ-জ্ঞান বা চিন্তার উপকরণ। ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বস্তু, গুণ, অবস্থা বা বিষয়বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত চেতনার ফলে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান জন্মে। সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ-জ্ঞান মানুষ শিশুর শৈশবে সীমাবদ্ধ। তারপরে নূতন নূতন অভিজ্ঞতা অর্জন করে পূর্ব লব্ধ প্রত্যক্ষ-জ্ঞান পরিবর্তিত হতে থাকে। বস্তু নিরপেক্ষভাবেও প্রত্যক্ষজ্ঞান অর্জিত হতে পারে। প্রত্যক্ষজ্ঞান ও অনুমান অনেক ক্ষেত্রে সম্পর্কযুক্ত। বিভিন্ন বস্তুর প্রত্যক্ষজ্ঞান ব্যক্তির অনুরাগ, বিরাগ, দৃষ্টিভঙ্গি ও পর্যবেক্ষণশক্তির ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে এবং প্রসঙ্গ ও পরিবেশ দ্বারা প্রত্যক্ষজ্ঞান প্রভাবান্বিত হয়।

Q. 9. Ans. (ii) **Paper II** ৪ (d) নং প্রশ্ন (পৃঃ ২৮) দ্রষ্টব্য।

(iii) Paper II ১০ (a) প্রশ্ন (পৃঃ ১৪৮ দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ হতে আরম্ভ করে) সংশ্লিষ্ট অংশ দ্রষ্টব্য।

(iv) **Paper II** ১৬ (c) নং প্রশ্ন (পৃঃ ১২৭) দ্রষ্টব্য।

(v) **Paper II** ৪ (f নং প্রশ্ন (পৃঃ ৩২) সংশ্লিষ্ট অংশ দ্রষ্টব্য।

(vi) **Paper II** ২২ নং প্রশ্ন (পৃঃ ১৭৯) দ্রষ্টব্য।

(vii) ১৯৫২ সালের **Paper I** ৮নং (পৃঃ ৪৫) দ্রষ্টব্য।

Paper III—History of Education

1961

Q. 1. Give critical estimate of the contributions of Froebel to modern educational thought.

Ans. ১৯৫০ সালের Paper III ৪নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

Q. 2. "Education is essentially a social process". Discuss this dictum of John Dewey.

Ans. ১৯৫০ সালের Paper III 4 (II) নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

Q. 3. Summarise the main events making the development of elementry education in England from 1862 to 1902.

Ans. ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে যে সংশোধিত কোড প্রকাশিত হ'লো তাতে প্রাথমিক শিক্ষার ন্যূনতম মানের নির্দেশ দেওয়া হ'য়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থাকবে ছয়টি শ্রেণী। নিম্নতম শ্রেণীতে ছয় বছরের শিশু ভর্তি হ'তে পারবে। প্রাথমিক শিক্ষার কার্য্যকারিতা বিচার হবে বৎসরান্তে পরীক্ষার মাধ্যমে। শুধু সেই সব ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে যারা সারা বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ ২০০ দিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত হবে। আগে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর বাৎসরিক সাহায্য নির্ভর ক'রতো বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপস্থিতির উপর। এখন থেকে তার দুই-তৃতীয়াংশ নির্ভর ক'রবে, বিদ্যালয়গুলির বার্ষিক পরীক্ষার ফলের উপর। বার্ষিক সাহায্যের মাথাপিছু হার ছিল বার শিলিং। এখন থেকে ৪ শিলিং দেওয়া হ'বে ছাত্রদের উপস্থিতির জন্য আর ৮ শিলিং দেওয়া হ'বে বার্ষিক পরীক্ষার ফলের জন্য এই সাহায্যদানের পদ্ধতিকে বলা হয় ফলানুগ সাহায্য-দান-পদ্ধতি। আগে যে শিক্ষকদের গুণানুসারে ব্যক্তিগত সাহায্য দেবার প্রথা ছিল, তা এখন থেকে রহিত হ'য়ে গেল।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট সভার অন্যতম সদস্য এবং শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা এক নবতম পদ্ধতির প্রবর্তন ক'রলেন। সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বার্ষিক পরীক্ষাপদ্ধতি চালু করা হ'লো। পরীক্ষার বিষয় হ'লো পঠন, লিখন আর গণিত। আগামী বর্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক কি হারে বেতন পাবেন তা সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রবে চলতি বছরের বিভিন্ন

শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষার ফলের ওপর। ফলানুসারে এই সরকারী সাহায্য-দানরীতি ইংলণ্ডের প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতিকে বহুলাংশে ব্যাহত ক'রেছিল। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হ'লো প্রাথমিক শিক্ষা সীমাবদ্ধ হ'য়ে রইলো কেবমমাত্র পঠন, লিখন আর গণিতের মধ্যে। বিদ্যালয়ে পাঠদান হ'য়ে প'ড়লো একান্ত গতানুগতিক ও একঘেয়ে; শিক্ষা হ'য়ে প'ড়লো ভীতিপ্রদ নিষ্পেষণের নামান্তর মাত্র। এই পদ্ধতির আর এক বিষময় ফল হ'লো এই যে রীতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ও সরকারী পরিদর্শকগণের মধ্যে এক অস্বাভাবিক বিরোধিতার সৃষ্টি ক'রল। সরকারী পরিদর্শকগণ, যাঁরা এই সব বিদ্যালয়ে বার্ষিক পরীক্ষা পরিচালনা ক'রতেন, শিক্ষাখাতে ব্যয় সঙ্কোচ অথবা প্রাথমিক শিক্ষার কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি কোনটাই ক'রে উঠতে পারেন নি। এই ক্ষতিকর প্রথা ইংলণ্ডের প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতিকে শ্লথ ক'রে তুলেছিল। শিক্ষকগণের নিজের গুণপনাকে তাঁদের বেতন নির্দ্ধারণের মাপকাঠি না ক'রে তাঁদের ছাত্রদের পরীক্ষার ফলকে তাঁদের বেতন স্থিরীকরণের একমাত্র উপায় করার কৃত্রিম রীতি ইংলণ্ডে প্রচলিত হ'য়েছিল তাহা শিক্ষক ও ছাত্রগণের স্বাভাবিক মধুর সম্পর্ককে অবাস্তব ক'রে তু'লছিল। আর সেই সঙ্গে শিক্ষকদের সঙ্গে সরকারপক্ষের সম্পর্কও বিরক্তিকর হ'য়ে উঠেছিল। ইংলণ্ডে এই প্রথা রহিত হবার পর থেকেই প্রাথমিক শিক্ষা মৃদুমন্দভাবে সুনির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হ'চ্ছিল।

লো সাহেব প্রবর্ত্তিত রিভাইজ্ড্ কোড্ ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষার সর্ব্ব অধ্যায়েই আনতে চেয়েছিল অভাবনীয় উন্নতি; কিন্তু এই পদ্ধতি ইংলণ্ডের পক্ষে অতিশয় আকস্মিক হ'য়েছিল ব'লতে হবে। কারণ, শিক্ষাবিভাগের প্রতিটি স্তরে বিস্তৃতভাবে ঘুণ ধ'রেছিল। আর লো সাহেব সেই ঘুণ সারাবার যে বিধি বাৎলে দিয়েছিলেন, তা হ'য়ে প'ড়েছিল যেমন কঠোর, তেমনই আকস্মিক। বিদ্যালয় পরিদর্শক ম্যাথু আর্ণল্ড্ এবং কমিটি অব্ কাউন্সিলের প্রথম সম্পাদক জেম্‌স্ কে সাট্‌লওয়ার্থ উভয়েই এই মত পোষণ ক'রতেন যে লো সাহেব প্রবর্ত্তিত রিভাইজ্ড্ কোড ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও উন্নতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো এবং সমগ্র পদ্ধতিটা বহুলাংশে যান্ত্রিক হ'য়ে প'ড়েছিল। এই কোড্ প্রবর্ত্তনের ফলে কিছুকালের জন্য অন্ততঃ শিক্ষকতাকামী লোকের অপ্রতুলতা ঘ'টেছিল। ফলানুসারে বেতন নির্দ্ধারণনীতিকে কোন শিক্ষকই পছন্দ করেন নি এবং নবতম পাঠ্য সূচী প্রবর্ত্তনে শিক্ষকদের স্বাধীনতায় অনেকখানি হস্তক্ষেপ করা হ'য়েছিল—এই ছিল অনেকের অভিমত। পরীক্ষা যখন ছাত্রগণের লব্ধ জ্ঞানের পরিমাপক হ'য়ে দাঁড়াল, তখন মুখস্থ বিদ্যার কদর

বাড়ল বেশী। রিভজাইড্ কোড্ গণ-শিক্ষার সমস্যার কোন সুসমঞ্জস সমাধান ক'রতে পারলো না। তাই কি পার্লামেণ্ট, কি জন-সাধারণের সভায়, সর্ব্বস্থানে শিক্ষা সংস্কারের আন্দোলন পুরোদমে চ'লতে লাগল। এই সময় ১৮৬৭ সনে যখন দ্বিতীয় সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হ'লো, তার ফলে ইংলণ্ডের জন-সাধারণ অধিকতর গণতান্ত্রিক অধিকার পেয়ে ছিল, তখন গণ-শিক্ষার আন্দোলনও অধিকতর শক্তি অর্জ্জন ক'রছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে কি ব্যক্তিগত প্রয়াস, কি স্বতোৎসারিত প্রচেষ্টা কোনটাই জন শিক্ষার ক্রমবর্দ্ধমান দাবীকে সন্তুষ্ট ক'রতে পারছিল না। জন-সাধারণ হৃদয়ঙ্গম ক'রতে লাগল যথাযোগ্য গণ-শিক্ষার প্রসারকল্পে রাষ্ট্রের সমষ্টিগত প্রয়াস একান্ত অপরিহার্য্য।

যখন দেখা গেল গণ-শিক্ষার দাবীকে আর কোনমতে উপেক্ষা করা যায় না, তখন ১৮৭০ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে বিধিবদ্ধ করার সরকারী প্রচেষ্টা করা হ'লো। তাই এই বৎসর পার্লামেণ্টে এক শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হ'লো। এর ফল হ'লো সুদূরপ্রসারী। দু'টো মূলনীতির উপরে দাঁড় করানো হ'লো এই আইনকে। প্রথমতঃ, স্থির করা হ'লো যে ইংলণ্ডের সর্ব্বস্থানে, বিশেষ ক'রে অনুন্নত স্থানগুলিতে, শিক্ষার প্রসার ক'রতে হবে। আর দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষা হবে সর্ব্বসাধারণের সহজ আয়ত্ত।

১৮৭০ সালে যে শিক্ষা-আইন বিধিবদ্ধ হয়েছিল তার নাম ফষ্টার আইন। কারণ, উইলিয়াম ফষ্টার এই শিক্ষাবিলকে হাউস অব্ কমন্সে উত্থাপন ক'রেছিলেন। নীচে এই বিলের কয়েকটি প্রয়োজনীয় ধারার উল্লেখ করা হ'লো :—

১। যে সকল স্থানে প্রাথমিক শিক্ষার যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেই, সেই সব স্থানে প্রাথমিক শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে ও সেখানে স্কুল বোর্ড্ স্থাপিত হবে।

২। স্কুল বোর্ডগুলির শিক্ষা শেস্ বসাবার অধিকার থাকবে।

৩। স্কুল বোর্ডগুলির স্ব স্ব এলাকায় পাঁচ থেকে বার বৎসরের ছাত্রদিগের বিদ্যালয়ে উপস্থিতিকে তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী বাধ্যতামূলক ক'রতে পারবেন।

৪। প্রাথমিক শিক্ষাকে অবশ্য এই স্তরে অবৈতনিক করা হবে না; তবে কোন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কারো দুঃস্থ অবস্থার জন্য অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা ক'রতে হবে, বোর্ডের তা করবার অধিকার থাকবে।

৫। যে সব প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারী সাহায্য পায়, সেগুলোতে কোন ব্যবস্থাই থাকবে না। বিশেষ বিশেষ এলাকায় যদি কোথায়ও ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ

অথবা ধর্ম্ম-ঘেঁষা শিক্ষা চালু করার প্রয়োজন অনুভূত হয়, তাহ'লে বোর্ড তাই ক'রতে পারবেন।

১৮৭০ সালের শিক্ষাবিধিকে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী প্রভাবের সম্প্রসারণ আর স্বৈচ্ছিক সংস্থার ক্রিয়াকলাপের মধ্যে আপোষমূলক মীমাংসার নামান্তর বলা চলে। এখন থেকে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা এবং সংগঠনের দায়িত্ব রাষ্ট্র ও স্বৈচ্ছিক সংস্থা উভয়েরই উপর বর্ত্তাবে। রাষ্ট্র যেমন স্থানীয়ভাবে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের মারফত প্রাথমিক শিক্ষাকে কার্য্যকরী করবার জন্য প্রয়াসী হবে, তেমন প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে স্বৈচ্ছিক প্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্রের সাহায্য পাবে; কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের উপর সরকারী তদারক থাকবে। বোর্ড পরিচালিত বিদ্যালয়গুলো হবে স্বেচ্ছাচালিত বিদ্যালয়গুলির পরিপূরক। এই বিধিতে বাধ্যতামূলক রীতির ইঙ্গিত সুস্পষ্ট; কিন্তু সে বাধ্যতা উপস্থিতির বাধ্যতা নয়, সে বাধ্যতা বিদ্যালয় খোলার বাধ্যতা। যথেষ্ট সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপনের আগে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির বাধ্যতার কোন প্রকার প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু বোর্ডগুলির হাতে এই শক্তি দিয়ে দেওয়া হ'য়েছিল, যাতে তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতিকে বাধ্যতামূলক ক'রে তুলতে পারেন।

প্রাথমিক শিক্ষাবিষয়ে যে স্থানীয় লোকদের দায়িত্ব আছে এই গুরুত্বপূর্ণ নীতি স্বীকৃত হ'য়েছে এই শিক্ষাবিধিতে। এখন প্রাথমিক শিক্ষা কোনমতে বেতনবিমুক্ত হবে না। তবে দুঃস্থ ঘরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্কুল বোর্ড এদের পক্ষ হ'য়ে বেতন দিয়ে দিতে পারেন; অথবা বোর্ড পরিচালিত বিদ্যায়তনগুলির মধ্যে এমন এক আধটি বিদ্যায়তন থাকতে পারে, যেখানে কোন প্রকার বেতন দিতে হবে না। দেশের সর্ব্বস্থানে যে বোর্ড বিদ্যালয় স্থাপিত হ'লো তা নয়; বরং দেশের যে সব অঞ্চলে বিদ্যালয়ের অপ্রতুলতা ছিল, সেই সব অঞ্চলে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা হলো।

প্রাইমারী বিদ্যায়তনগুলিতে কোন প্রকার ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হবে কিনা এই নিয়ে বহু বাদবিতর্ক ও তিক্ততা সৃষ্টি হ'য়েছিল। ইংলণ্ডের বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিপত্তিশালী কয়েকটি সম্প্রদায়ের (যেমন রোমান ক্যাথলিক, এস্ট্যাবলিশড্ চার্চ এবং নন্কন্ফর্মিষ্ট্) মধ্যে এ বিষয়ে যথেষ্ট মতানৈক্য ছিল। ১৮৭০ সালের শিক্ষাবিধিতে অবশ্য একটি মধ্য-পন্থা অবলম্বিত হ'য়েছিল। এই বিধিতে ধর্ম্ম ব্যাপার নিয়ে একটি বিশেষ ধারা ছিল। সেই ধারাকে বলা হ'য়েছে কন্সান্স্ ধারা। যে সব প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারী সাহায্য লাভ করবে সেই সব বিদ্যালয়ে এই ধারা আবশ্যিকভাবে পালিত হবে। এই ধারাতে বলা

হয়েছে যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোন ছাত্রছাত্রীকে বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার ক্লাসে উপস্থিত থাকতেই হবে এমন কোন কথা নেই; অথবা কোন বিদ্যালয়ের প্রবেশাধিকার বিশেষ কোন ধর্ম্মমতের ওপর নির্ভর ক'রবে না। অর্থাৎ ধর্ম্ম-শিক্ষাব্যাপারে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পেল। বোর্ড পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে ধর্ম্মশিক্ষাবিষয়ে এই বিধিতে অন্য একটি ভিন্ন ধারা ছিল। এই বিশেষ ধারার নাম কাউপার্-টেম্পল ধারা। এই ধারায় বলা হ'য়েছে যে বোর্ডপরিচালিত বিদ্যালয় গুলিতে বিশেষ কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়গত শিক্ষাব্যবস্থা আর চালু থাকবে না।

বিভেদের অধ্যায়ঃ— (১৮৭০-১৯০২) ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের সূচনা হ'লো ১৮৭০ সালের শিক্ষাবিধি প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আর এই পদ্ধতির পূর্ণ পরিণতি ঘটলো ১৯০২ সালে অন্য এক শিক্ষাবিধির প্রবর্ত্তনে। এই ত্রিশ বৎসরের বেশী সময়ের মধ্যে ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা ধীরে বিবর্ত্তনের মাধ্যমে দেশে কায়েমী হ'য়ে উঠেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ চার দশকে ইংলণ্ডের লোকেরা অন্ততঃ এইটুকু বুঝবার চেষ্টা ক'রছিল যে দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে পরহিতোবুদ্ধ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা অথবা প্রতিষ্ঠানগত প্রয়াসের দিন শেষ হ'য়েছে। শিক্ষা যে সামগ্রিকভাবে জাতিগত ব্যাপার, এটা যে একটা দেশগত তথা রাষ্ট্রগত ব্যাপার, সেখানে বিশেষ কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের একাধিপত্য নেই, তা সর্ব্বসাধারণের, এবং সেখানে সকলের সমান অধিকার এবং সমসুযোগ ইত্যাদি বিষয় ইংলণ্ডের জন-সাধারণ বুঝতে সুরু ক'রেছিল।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এক নতুন কোড্ হ'লো প্রবর্ত্তিত। কি ভাবে সরকারী সাহায্য বিদ্যালয়গুলির মধ্যে বিতরিত হবে সে বিষয়ে এই কোডে অদল-বদলের ইঙ্গিত ছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদিগের উপস্থিতি যাতে অধিকতর নিয়মিত হয়, যাতে বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীগণের যথোপযুক্ত স্থান-সঙ্কুলান হয় এবং যাতে শিক্ষাদানের সাধারণ মান সবিশেষ উন্নত হয়, সেসব বিষয়ে পন্থা অবলম্বনের জন্য এই কোডে কয়েকটি সাধু প্রস্তাব করা হ'য়েছে।

১৮৭৬ সালে আবার একটি শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হ'লো। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার প্রয়াসকে এই বিধি আর একটু এগিয়ে দিল। এই আইনে এই নিয়ম ক'রে দেওয়া হ'লো যে প্রত্যেক মাতাপিতা যেন দেখেন তাঁর সন্তান সন্ততি যথোপযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষা পায়, অর্থাৎ পঠন, লিখন আর গণিতে তাদের যেন কার্য্যকরী জ্ঞানলাভ হয়। যাঁরা হবেন ব্যত্যয়কারী, তাঁদের জরিমানা দিতেই হবে। এই বিধির এই সব ধারাকে কার্য্যকরী ক'রে

তোলা যায়, সে বিষয়ে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষদিগকে যেমন স্কুল বোর্ডগুলোকে, এ বিষয়ে দায়িত্ব অর্পণ করা হ'লো। যে সব স্থানে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের অভাব ছিল, সেই সব জায়গায় বিদ্যালয় উপস্থিতি-সমিতি সংস্থাপিত হ'লো। তাদের কর্ত্তব্য হ'লো এই শিক্ষাবিধির ধারাগুলি যাতে সকলের দ্বারা প্রতি-পালিত হয় সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া।

এই সময়ে ইংলণ্ডে যে সব কারখানা আইন পাশ করা হ'য়েছিল, শিক্ষার দিক দিয়ে তাদের গুরুত্ব কম নয়। কারখানাগুলোতে কত বয়সের ছেলেরা কাজ ক'রতে পারবে, আর কোন বয়সের ছেলেরা সেখানে কাজ ক'রতে পারবে না ইত্যাদি বিষয় এবং সেই সঙ্গে এই সব ছেলেদের বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক যোগদান বিধিবদ্ধ হ'য়েছিল এ সব আইনে। কারখানা আইনগুলো যেমন পরোক্ষভাবে ছেলেদের বিদ্যালয়ে যোগদান আবশ্যিক করে তুললো, তেমন এই সময়কার শিক্ষা-আইনগুলো এই বিষয়টিকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়মাধীন ক'রে ফেললো। ১৮৭৪ সালের কারখানা-আইনে এই স্থির হ'লো যে দশ বছর বয়সের কমবয়সী ছেলেদেরকে কোন কলকারখানায় নিয়োগ করা হবে না। দশ থেকে চৌদ্দ বছরের ছেলেরা কল-কারখানাগুলোতে অর্দ্ধদিন খাটবার সুযোগ পেতে পারে, যদি তারা বাকী অর্দ্ধসময় কোন বিদ্যালয়ে যোগদান করে। বিদ্যালয়ে এও একপ্রকার বাধ্যতামূলক উপস্থিতি। বিদ্যালয়ে অর্দ্ধসময় উপস্থিতির অর্থ এই হ'লো যে এক সপ্তাহে কারখানার শ্রমিক ছেলেরা সকালের দিকে বিদ্যালয়ে যোগদান ক'রবে; পরের সপ্তাহে সেই সব ছাত্র আবার বিকালে বিদ্যালয়ে যোগদান ক'রবে। এই প্রথাই বেশ কিছুদিন নিয়মিতভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু এতে অসুবিধা ছিল অনেক।

অবশ্য এই সময়ে প্রাথমিক শিক্ষাকে বেতনহীন ক'রে তোলার ক্রমবর্দ্ধমান প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। সারা উনবিংশ শতাব্দীতে দেখা যায় যে বিনা বেতনে শিক্ষালাভ যেন সাধারণের ধারণার বাইরে; অবশ্য যত দিন যেতে লাগল, ততই বিদ্যালয়ে অবৈতনিক ছাত্রের সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। এর জন্য বিদ্যালয়গুলোতে আয়ের দিক থেকে যে ক্ষতি হ'তো, সরকার অবশ্য তা সব পুষিয়ে দিতেন।

১৮৮০ সালে আর এক শিক্ষাবিধি পাস হলো। এই আইনের বলে স্কুল-বোর্ডগুলি ও বিদ্যালয়-উপস্থিতি-সমিতির উপর এই ভার দেওয়া হ'লো যে বিদ্যালয়ে ছাত্রদের উপস্থিতি সম্বন্ধে এঁরা উপবিধি ক'রতে পারবেন। এই সময়ে ইংলণ্ডে অবশ্য নানান ধরণের প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল যেমন—শিশু-বিভাগ,

জুনিয়র স্কুল, সিনিয়র স্কুল ও হায়ার গ্রেড্ স্কুল। এগুলির অধিকাংশতেই প্রচলিত ছিল সহ-শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষার সংগঠন ব্যাপারে সমগ্র দেশে সমবিধি প্রবর্ত্তিত ছিল না। এগার অথবা বার বৎসরে প্রাথমিক শিক্ষার পর যতি টেনে দেবার দিকে ঝোঁকটাই পরিলক্ষিত হ'চ্ছিল। প্রাথমিকোত্তর শিক্ষার ধারণা সম্বন্ধে এই সময় ইংরেজদের মনে একটি সচেতনভাবে বেশ দানা বেঁধে উঠছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঠিতব্য বিষয়গুলি শিক্ষাবিভাগের বাৎসরিক নিয়মাবলীতে প্রকাশিত হ'তো। পাঠ্য বিষয়গুলির মধ্যে কতকগুলি ছিল অবশ্যপাঠ্য আর কতকগুলি ছিল ঐচ্ছিক। যে সমস্ত বিষয় প্রাথমিক বিদ্যায়তনে পড়ানো হ'তো সেগুলোর জন্য একটা খসড়া সিলেবাস্ করার বিধি চালু করা হ'লো। প্রতিটি বিষয়ের পাঠদানের উপর নির্ভর ক'রতো সরকারী সাহায্য। সরকারী সাহায্যের হার নির্ভর ক'রতো কোনো বিষয়ের পরীক্ষায় ছাত্রগণ কতখানি জ্ঞান আহরণ ক'রেছে তার উপর।

১৮৮৬ সালে লর্ড ক্রসের সভাপতিত্বে ইংলণ্ডে আর ওয়েল্‌সে শিক্ষা-আইনগুলো কতখানি কার্য্যকরী হ'য়েছে তা অনুসন্ধান করবার জন্য এক রাজকীয় কমিশন বসানো হ'লো। প্রাথমিক শিক্ষার সব দিক এবং প্রধান সমস্যার সম্বন্ধে কমিশন ব্যাপক তদন্ত চালালেন। পুরা দুই বছর লাগলো তথ্যাদি সংগ্রহ ক'রতে। অনুসন্ধান শেষ হবার পর দুটো বিবরণী প্রকাশ করা হ'লো। এই দুটোর মধ্যে একটিতে ছিল কমিশনের সভ্যবৃন্দের পনের জনের স্বাক্ষর, অপরটিতে ছিল মাত্র আট জনের স্বাক্ষর। বোর্ড স্কুলগুলির ধর্ম্মনিরপেক্ষ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় করপুষ্ট বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা প্রবর্ত্তন করার পক্ষপাতী ছিলেন কমিশনের অধিকাংশ সভ্যই। কমিশনের সংখ্যালঘুদল অবশ্য এই মতের পরিপন্থী ছিলেন। তাঁরা চাইছিলেন স্থানীয় শিক্ষাকর যেন কোনমতে বিশেষ কোন ধর্ম্মঘেঁষা শিক্ষাদানের জন্য ব্যয়িত না হয়। কমিশনের সংখ্যাগুরু দল অবশ্য চাইছিলেন যে শিক্ষাবিষয়ে ব্যক্তিগত প্রয়াস এখনো চালু থাক। তাঁদের আরও অভিমত এই ছিল যে ১৮৭০ সালের শিক্ষাবিধির কাউপার-টেম্পল্-ধারা, যা বোর্ড-পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে ধর্ম্মনিরপেক্ষ শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রেছিল, তা যেন রহিত হ'য়ে যায়। অন্যদিকে সংখ্যালঘু দল চাইছিলেন শিক্ষাকে রাষ্ট্রায়ত্ত ক'রতে আর সেই সঙ্গে ১৮৭০ সালের শিক্ষাবিধির কাউপার-টেম্পল্-ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে।

ক্রস্ কমিশন অন্যান্য সুপারিশের সঙ্গে এও সুপারিশ ক'রেছিলেন যে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের স্থান সঙ্কুলানের ব্যবস্থা যেন উন্নত ধরণের হয়;

বিদ্যালয়ের পরিবেশ যেন উপযুক্তভাবে স্বাস্থ্যকর হয়। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের উপস্থিতি সম্বন্ধে যেন অধিকতর কঠোর নীতি প্রবর্ত্তিত হয়। ধর্মশিক্ষা যেন কোন মতেই রহিত না হয়। বিদ্যালয়ে পরীক্ষার ফলানুসারে সাহায্য-দান-নীতি যেন বেশী দিন অনুসৃত না হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে যে স্তর-বিভেদ আছে সেটা যেন সর্ব্বজনস্বীকৃত হয় এবং ১৮৭০ সালের শিক্ষা আইনের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে যে দ্বৈত শাসননীতি প্রবর্ত্তিত হ'য়েছিল তা বিদূরিত ক'রে তার স্থলে অধিকতর কেন্দ্রীভূত কোন কার্য্যকরী শাসনব্যবস্থা যেন চালু করা হয়। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে ক্রস্ কমিশনের বিবরণী ইংলণ্ডের শিক্ষাপদ্ধতির বিভিন্ন সমস্যার প্রতি জনসাধারণের মনযোগকে আকর্ষণ ক'রেছিল।

১৮৯১ সালে পার্লামেণ্টে ফ্রি স্কুলিং এলিমেণ্টারী এডুকেশন এ্যাক্ট্ বিধিবদ্ধ হ'লো। প্রাথমিক শিক্ষাকে যতদূর সম্ভব অবৈতনিক করা যায়, সেদিকে সেই আইনের সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। এমন ব্যবস্থা করা হ'লো যাতে ইংলণ্ডে এমন কোন ডিস্ট্রিক্ট্ না থাকে যেখানে কোন অবৈতনিক বিদ্যালয় থাকবে না। ১৮৯৩ সালে আর এক শিক্ষাবিধি পাস হ'লো যার ফলে ইংলণ্ডে দৃষ্টিহীন এবং শ্রবণশক্তিহীন ছাত্রদের জন্য বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হ'লো। ১৮৯৯ সালে অনুরূপ আর এক আইন করা হ'লো। এই আইনের বলে ইংলণ্ডের বিকলদেহ এবং মূর্চ্ছাপ্রবণ শিশুদের জন্য বিশেষ ধরণের শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হ'লো।

১৮৯৯ সালে আর এক শিক্ষাআইন বিধিবদ্ধ হ'লো। এই আইনানুসারে ইংলণ্ডে স্থাপিত হ'লো বোর্ড অব্ এডুকেশন। এই বোর্ডের সভাপতি থাকবেন একজন, যিনি হবেন মন্ত্রীর ন্যায় দায়িত্বশীল। তাঁর কাজে সাহায্য করবার জন্য তাঁর অধীনে একজন পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারীও থাকবেন। রাষ্ট্রের মধ্যে সমস্ত শিক্ষামূলক কার্য্যাবলীকে কেন্দ্রানুগ করার কাজ হ'লো এই বোর্ডের। দেশের মধ্যে যত সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলোর পরিচালনা এবং তত্ত্বাবধানের ভারও এই বোর্ডের ওপর অর্পণ করা হ'লো। একটি পরামর্শদাতা সমিতি স্থাপনেরও ব্যবস্থা করা হ'লো এই আইনে। এখন থেকে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে বোর্ড অব্ এডুকেশন সরকারী শিক্ষাবিভাগ ও বিজ্ঞান এবং কলাবিভাগের স্থলাভিষিক্ত হবে। বোর্ড অব্ এডুকেশনের উপর বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শনের ভার দেওয়া হ'লো এবং এই বোর্ড শিক্ষাবিষয়ে কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃপক্ষরূপে কাজ ক'রে যেতে লাগলো। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে যে শিক্ষাবিধি প্রবর্ত্তিত হ'য়েছিল তাতে ইংলণ্ডে যে পরীক্ষার ফলানুসারে সরকারী সাহায্যদান-নীতি এতদিন

চালু ছিল, তা রহিত হ'য়ে গেল। এদিকে আবার স্কুলবোর্ডগুলি জনসাধারণের নিকট অপ্রিয় হ'য়ে উঠছিল এবং তাদের প্রতিপত্তিও আসছিল ক'মে। স্বৈচ্ছিক বিদ্যালয়গুলিও শিক্ষার মান উন্নয়নের ফলে আর্থিক দিক দিয়ে বেশ গোলমালে প'ড়েছিল।

এদিকে বোর্ডস্কুলের সমর্থক এবং তাঁদের বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে সংঘাত দিন দিন সঙ্গীন হয়ে উঠছিল। স্কুল বোর্ডের সরকারী সাহায্যের টাকা নিয়ে যে সব বিষয়ে পড়াবার জন্য ঐ টাকা খরচ করার কথা নয় সে সব বিষয়ে ঐ টাকা খরচ করবার অধিকার আছে কি না সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠলো। ১৮৯১ সালে মিঃ ককারটন্ নামে এক সরকারী অডিটর্ বিজ্ঞান ও কলা শ্রেণীর জন্য বরাদ্দ অর্থকে বয়স্কশিক্ষাবাবদে খরচ করার জন্য লণ্ডন স্কুল বোর্ডের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ আনেন। ১৮৭০ সালের অথবা পরবর্ত্তী কালের শিক্ষাবিধিগুলোতে এই ভাবে এক খাতের অর্থকে অন্য বাবদে খরচ করবার অধিকার কাউকে দেওয়া হয়নি। লণ্ডন স্কুল বোর্ড কোর্টের আশ্রয় নিলেন। কিন্তু তাতে বিশেষ কোন ফল হ'লো না। ইংলণ্ডে শিক্ষার ইতিহাসে এই মোকদ্দমা একটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই মোকদ্দমার বিচারের রায় ককারটন্ রায় নামে পরিচিত। বিচারে এই সাব্যস্ত হ'লো যে স্কুল বোর্ডের সরকারী সাহায্যকে কেবলমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যয় করার অধিকার আছে এবং তাও কেবল ১৫ বছর পর্য্যন্ত বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য। এই রায়ের ফলে ইংলণ্ডে এক অচল পরিস্থিতির সৃষ্টি হ'লো। কিন্তু স্কুল বোর্ড গুলি যে সব বিষয়ে কোন অর্থ বরাদ্দ করা নেই সে সব বিষয়েও সরকারী সাহায্যের টাকা ব্যয় ক'রে যেতে লাগলেন। এই অবাঞ্ছিত কারণে ১৯০২ সালের শিক্ষা আইনের উপযোগিতা দ্রুততর হ'য়ে দাঁড়ালো। তাই এই বছরেই বোর্ড্ অব্ এডুকেশনের প্রেসিডেণ্ট এ, জে, ব্যালফুর সাহেব পার্লামেণ্টে নূতন বিল উত্থাপন করলেন এবং ঐ বিলই ব্যালফুর এ্যাক্ট্ নামে খ্যাত।

১৯০২ সালে শিক্ষাবিধির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা নীচে দেওয়া হ'লো।

(১) স্কুল বোর্ডগুলির স্থলে স্থাপিত হবে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ। এগুলো হবে স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল আবার চার রকমের, যেমন কাউন্টি কাউন্সিল, কাউন্টি বরো কাউন্সিল, আর্বাণ ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ও বরো কাউন্সিল। কাউন্টি কাউন্সিলের ৫০,০০০ এর বেশী অধিবাসী থাকলে, কাউন্টি বরো কাউন্সিলের ২০ হাজার থেকে ৫০,০০০ এর মধ্যে অধিবাসী থাকলে, আর্বান ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের ২০,০০০ অধিবাসী

থাকলে এবং বরো কাউন্সিলের দশ হাজারের বেশী অধিবাসী থাকলে এই সব প্রতিষ্ঠানগুলোকে শিক্ষাব্যবস্থাপনার ভার দেওয়া হবে।

(২) এই শিক্ষাবিধির ২নং সিডিউলে প্রথমোক্ত দুইটি প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ থাকায় এখানকার শিক্ষাকর্তৃপক্ষকে বলা হ'তো পার্টটু শিক্ষাকর্তৃপক্ষ এবং ৩নং সিডিউলে শেষোক্ত দুই প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ থাকায় সেখানকার শিক্ষাকর্তৃপক্ষের নাম দেওয়া হ'য়েছিল পার্ট থ্রি শিক্ষাকর্তৃপক্ষ।

(৩) পূর্ব্বতন স্কুলবোর্ড এবং এ্যাটেন্ড্যান্স্ কমিটির যে কাজ ছিল সেই কাজ এখন থেকে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের উপর বর্ত্তাবে।

(৪) স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের শিক্ষাকর বসাবার শক্তি থাকবে।

৫) স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ তাঁদের এডুকেশন কমিটির মাধ্যমে কাজ কর্ম্ম চালাবেন। কাউন্সিলের সকল সভ্য ও যে সকল ব্যক্তির শিক্ষাবিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরাই এই এডুকেশন কমিটির সদস্য হ'তে পারবেন। স্থানীয় শিক্ষাকর তোলবার অধিকার ছাড়া কাউন্সিলগুলো তাঁদের শিক্ষাবিষয়ক সমস্ত দায়িত্ব এই এডুকেশন কমিটির উপর অর্পণ ক'রতে পারবেন।

(৬) ভলান্টারী স্কুলগুলোর ব্যবস্থাপনায় একই নীতি যাতে অনুসৃত হয়, সেই নির্দ্দেশই এই বিধিতে দেওয়া হ'য়েছে। ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের মধ্যে চারজন ভলান্টারী সংস্থার প্রতিনিধি আর দুজন হবেন কাউন্সিলের দ্বারা নিযুক্ত।

(৭) সকল প্রকার বিদ্যালয়ে, যেমন,—কাউন্সিল স্কুল, মিউনিসিপ্যাল স্কুল ও ভলান্টারী স্কুলের ধর্ম্মবর্জ্জিত শিক্ষার নিয়ন্ত্রণভার থাকবে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের ওপর। যে সকল প্রোভাইডেড্ বিদ্যালয় স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থাপিত হবে, সেগুলোতে কি ধরণের এবং কতখানি ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হবে তা স্থির ক'রবে শুধু স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ, অবশ্য ১৮৭০ সালের শিক্ষাবিধির কাউপার-টেম্পল ধারার প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রেখে। নন্‌প্রোভাইডেড্ বিদ্যালয়গুলিতে ধর্ম্মশিক্ষার প্রকৃতি ও পরিমাণ স্থির ক'রবেন তাদের ব্যবস্থাপকগণ। সকল বিদ্যালয়েই ১৮৭০ সালের শিক্ষাবিধির কন্‌সানস ক্লজ্ আচরিত হবে।

১৯০২ সালের শিক্ষাবিধি ইংলণ্ডের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চতর এবং কারিগরী শিক্ষার সংগঠনব্যবস্থাকে স্বায়ত্ত শাসনমূলক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠা ক'রেছিল। যে কর্তৃপক্ষের ওপর এতদিন স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের ভার অর্পিত ছিল, তার ওপর এখন আবার শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা হ'লো। এই আইন

পাস হওয়ার ফলে ইংলণ্ড থেকে স্কুল বোর্ড এবং স্কুল এ্যাটেন্ড্যান্স, কমিটিগুলো উঠে গেল। এতদিন যে সব কাউন্সিল স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন চালিয়ে আসছিল তার ওপরই শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা হ'লো। বোর্ড স্কুলগুলো কাউন্সিল স্কুল রূপান্তরিত হ'লো। ভলান্টারি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত অনেক বিদ্যালয় কাউন্সিল স্কুলে পরিবর্তীত হ'লো। চার্চপরিচালিত অনেক বিদ্যালয়ই আগের মত ভলান্টারি ব্যবস্থাপক সমিতির নিয়ন্ত্রণাধীন হ'য়ে রইলো; অবশ্য এই সব বিদ্যালয়ের অনেকেই পৌর সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। ভলান্টারি স্কুলগুলোকে কাউন্সিল স্কুলে পরিণত ক'রতে স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষের যথেষ্ট বেগ পেতে হ'য়েছিল।

স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষের আবার প্রকারভেদ ছিল। কাউন্টি কাউন্সিল আর কাউন্টি বরো কাউন্সিলগুলোকে বলা হ'তো পার্ট টু স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ এবং বরো ও আর্বান ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলগুলোর নাম দেওয়া হ'য়েছিল পার্ট থ্রি স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষ।

পার্ট টু স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ অবশ্য ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য দায়ী ছিল না। তবে এই সকল শিক্ষাকর্তৃপক্ষ তাঁহাদের সীমানার মধ্যে যে সব প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকতো, তাদের ব্যয়নির্বাহের ভার নিতেন এবং তাঁদের এলাকার মধ্যে সর্বপ্রকার শিক্ষার মধ্যে সমতা রক্ষা ক'রে বিভিন্ন শিক্ষাধারার ভারসাম্য রাখবার প্রয়াসী হ'তেন। পার্ট থ্রি স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের ওপর কেবল প্রাথমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণভার অর্পিত ছিল। আবার এই নিয়ন্ত্রণের তারতম্য ছিল। তখন অবশ্য ইংলণ্ডে মোটামুটি দুই ধরণের বিদ্যালয় পরিলক্ষিত হ'তো। এক ধরণের বিদ্যালয় হ'লো প্রোভাইডেড্ আর এক ধরণের হ'লো নন্-প্রোভাইডেড্। যে সব বিদ্যালয় সরাসরিভাবে ও সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা নির্মিত ও সর্ব্বোপায়ে সমর্থিত হ'তো তাদেরকে বলা হ'তো প্রোভাইডেড বিদ্যালয় আর যে সব বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও নির্ম্মাণের কাজ সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর নির্ভর ক'রতো কিন্তু যারা সাহায্য পেতো স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষদের কাছ থেকে এবং যাদের ওপর স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ ছিল পরোক্ষ তাদের বলা হ'তো নন্-প্রোভাইডেড বিদ্যালয়।

ইংলণ্ডে শিক্ষার ইতিহাসে ১৯০২ সনের শিক্ষাবিধি এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে আছে। এই সময় থেকে অবসান হ'লো বিভেদের অধ্যায় এবং সুরু হ'লো সংযোগের যুগ। ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে স্বৈচ্ছিক

প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাহায্য এবং তদারক করার নীতি হ'লো পরিবর্জ্জিত। রাষ্ট্র স্বয়ং গণ-শিক্ষার গুরু দায়িত্ব নিজস্কন্ধে গ্রহণ ক'রলো। শিক্ষার সর্ব্বস্তর যাতে বিশেষভাবে কেন্দ্রানুগ হ'য়ে ওঠে সেদিকে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে বলা হ'লো। এর ফলে ইংলণ্ডের জাতিগত শিক্ষার সাধারণ মান সবিশেষ উন্নীত হ'লো।

১৯০২ সনের শিক্ষাবিধিতে লণ্ডনের কথা উল্লিখিত হয় নি। পরবর্ত্তী বৎসরে মুখ্যতঃ ১৯০২ সনের শিক্ষাবিধির অনুকরণে আর একটি আইন পাস করা হ'লো যার ফলে লণ্ডনের কাউণ্টি কাউন্সিল রূপান্তরিত হ'লো স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষে।

Q. 4. Give a critical account of the findings of the Clarendon Commission 1861-64 on the nine great Public Schools of England, and Subsequent enactment of the Public Schools Act 1868.

Ans. অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা নিম্নতম স্তরে নেমেছিল। এই অভাবনীয় অবনতির পশ্চাতে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি নানাবিধ কারণ ছিল। এই সময়ে ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে এক সর্ব্বনাশা দুর্নীতি প্রবেশ ক'রেছিল। এই সময়কার মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা কয়েকটি বাহিক আচারেই ছিল পর্য্যবসিত। সারা অষ্টাদশ শতাব্দী এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের পাবলিক স্কুল এবং গ্রামার স্কুলগুলো দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রতো। এই সমস্ত বিদ্যালয়ের দ্বার সাধারণ লোকের সন্তান-সন্ততিদের নিকট ছিল একেবারে অবরুদ্ধ; সঙ্গতি সম্পন্ন অভিজাত ব্যক্তিদের বংশধরগণই এই সব শিক্ষায়তনে প্রবেশাধিকার পেতো। অবশ্য নিম্নতম শ্রেণীর মেধাবী ছাত্ররাও এতে প্রবেশাধিকার পেতো। পাবলিকস্কুল ও গ্রামারস্কুলে যে ধরণের শিক্ষা প্রবর্ত্তিত ছিল তা ছিল পুরোপুরি প্রাচীনপন্থী এখানে কেবল গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা শেখানো হ'তো। এখানকার পড়ুয়ারা শিক্ষাসমাপনান্তে ভবিষ্যতে যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ ক'রতে পারে, সেদিকেই ছিল কর্তৃপক্ষের সদাসতর্ক দৃষ্টি। পাবলিক স্কুল অথবা গ্রামার স্কুল থেকে যে সব শিক্ষার্থী তাঁদের পড়া শেষ ক'রে কর্ম্মজীবনে প্রবেশ ক'রতেন তাঁরা সাধারণতঃ শিক্ষামূলক কোন না কোন বৃত্তি নির্ব্বাচন ক'রে তাঁদে জীবিকার্জ্জন ক'রতেন। সেদিক দিয়ে বিচার ক'রতে

গেলে গ্রামার স্কুলগুলোকে ভোকেশানাল স্কুলের পর্য্যায়ে ফেলা যায়। পাবলিক স্কুল এবং গ্রামার স্কুলগুলোতে কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রবর্ত্তিত ছিল।

১৮৬১ সালে ক্লারেণ্ডন সাহেবের অধিনায়কত্বে পাবলিক স্কুলগুলোর ক্রিয়াকলাপ অনুসন্ধানের জন্য এক রাজকীয় কমিশন বসানো হ'লো। এই কমিশনকে আবার পাবলিক স্কুলস্ কমিশনও বলা হ'য়ে থাকে। কয়েকটি বিশেষ বিশেষ কলেজ, স্কুল ও ফাউণ্ডেশন্ প্রভৃতির দেবত্ব সম্পত্তি, মজুত টাকা এবং আয়ব্যয় ইত্যাদি তাদের ব্যবস্থাপনা, এসব বিদ্যালয়ে কি পদ্ধতিতে পাঠদান করা হয় এবং সেখানে কি কি বিষয়ই বা পড়ানো হয়, ইত্যাদি বিষয়ের তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য এই কমিশন বসানো হ'য়েছিল। সাতটি স্থানের আবাসিক বিদ্যালয়, যেমন ইটন, উইঞ্চেষ্টার, ওয়েষ্টমিনিষ্টার, চ্যাটারহাউস হ্যারো, রাগবি ও শ্রুস্‌বেরি এবং দুইটি স্থানের দিবা বিদ্যালয় যথা সেণ্ট্ পলস্ ও মার্চেণ্ট্ টেলর্স্ প্রভৃতি বিদ্যায়তনের ক্রিয়াকলাপের তদন্তাদি করবার জন্য কমিশনকে নির্দ্দেশ দেওয়া হ'য়েছিল।

রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা ইংলণ্ডে এই সর্ব্বপ্রথম সংসাধিত হ'লো। অবশ্য মাধ্যমিক বিদ্যালয় ব'লতে এখানে এনডাউড বিদ্যালয়গুলোকেই বুঝিয়েছে। ক্ল্যারেণ্ডন কমিশন ১৮৬৪ সালে এঁদের বিবরণ প্রকাশ ক'রলেন। কমিশন স্বীকার ক'রলেন যে বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এই সব পাবলিক স্কুলে যদিও যথেষ্ট উন্নতি হ'য়েছে যদিও এখানের পাঠ্য—সূচীকে অনেকখানি বিস্তৃত এবং ব্যাপক করা হ'য়েছে, তথাপি নতুন নতুন বিষয় যেমন গণিত, আধুনিক ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, ইত্যাদি কৌলীন্যে ছিল নিকৃষ্ট এবং পাঠ্যসূচীতে বিজ্ঞানের কোন নামগন্ধ ছিলই না। কমিশন অবশ্য অকুণ্ঠভাবে একথা স্বীকার ক'রলেন যে নয়টি পাবলিক স্কুল গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা শিক্ষা দেবার উপযোগিতা এবং প্রয়োজনীয়তা অনেকখানি এবং এই সব বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান এবং এখানকার নিয়মানুবর্ত্তিতা সত্যই প্রশংসনীয়। বিদ্যালয়ের পরিগমে সমষ্টিগত জীবনের মাধ্যমে এদের শিক্ষার্থীদের চরিত্রগঠনের কথা কমিশন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ক'রলেন। কিন্তু এই পাবলিক স্কুলগুলো পরিচালনা ব্যাপারে যে ঘোরতর ত্রুটি ছিল সে বিষয়ের উল্লেখ না ক'রে কমিশন পারলেন না। সেটা হ'চ্ছে এই যে সমস্ত ট্রাষ্ট্ এই সব পাবলিক স্কুল পরিচালনা ক'রতেন, তাঁরা এদের পরিচালনা এবং এখানকার পাঠ্যসূচী প্রস্তুতির ব্যাপারে এমন কয়েকটি পীড়নমূলক বাধার সৃষ্টি ক'রেছিলেন যেগুলো কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়।

পাবলিক স্কুলস্ কমিশনের দুই একটি সুপারিশ নীচে লিপিবদ্ধ করা হলো :-

(১) এই সব পাবলিক স্কুলের পরিচালকমণ্ডলীর আশু পুনর্গঠন প্রয়োজন। এই সব বিদ্যায়তনের প্রধান প্রধান শিক্ষকগণের শক্তির যথাযথ সংজ্ঞা নিরূপিত থাকা একান্ত আবশ্যক। সমস্ত সহকারী শিক্ষক অথবা তাঁদের প্রতিনিধি নিয়ে এই নব বিদ্যালয়ে শিক্ষাসমিতি থাকা একান্ত প্রয়োজন।

(২) প্রাচীন ভাষা এবং সাহিত্য শিক্ষার প্রধান্য অবশ্য এই সব বিদ্যায়তনে থাকবে ; কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে সংযোজিত হবে অঙ্ক ও গণিত, অন্ততঃ একটি আধুনিক ভাষা যথা ফরাসী অথবা জার্ম্মাণ, প্রকৃতি বিজ্ঞানের যে কোন শাখা, অঙ্কন অথবা সঙ্গীত, ভূগোল এবং প্রাচীন ও বর্ত্তমান ইতিহাস।

ক্ল্যারেণ্ডন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৮৬৮ সালে পাবলিক স্কুলস্ এ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হ'ল। এই আইনের বলে সাতটি পাবলিক স্কুলের পরিচালকমণ্ডলীর পুনঃসংগঠন করবার প্রচেষ্টা হ'লো। যাতে ক'রে বিদ্যালয়গুলোর ব্যবস্থাপক-সমিতি অধিকতর প্রতিনিধিত্বমূলক ক'রে তোলা যায়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হ'তে লাগলো সরকারী পক্ষ থেকে।

Q. 5. Trace the history of education in ancient India with special referance to the Parishads, the tols and the path—Salas.

Ans. আর্যগণ ভারতে আসবার পর এদেশে তারা একটা নিজস্ব শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত সেই ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থা কালের জটিল কটাক্ষকে উপেক্ষা করে বংশানুক্রমে চলে এসেছে আধুনিক কাল পর্যন্ত। ভারতের বুকে বহু পরির্তন কার্য গিয়েছে বহু উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে সেই সুপ্রাচীন শিক্ষাধারা নিজের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখে ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থায় স্থায়ীভাবে রয়ে গিয়েছে। বৈদিক আর্যযুগ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত এ শিক্ষাধারা ইতিহাসকে অনুসরণ করা কষ্ট সাধ্য কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ও ধর্ম্মজগতে যে পরিবর্তনই হোক না কেন ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থার রীতি, পদ্ধতি, পাঠক্রমের বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না।

প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে এ শিক্ষা ব্যবস্থা আপনার বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে এগিয়ে চলেছে। মুসলিম আক্রমণ ও বিজয়ের পর ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ উভয় শিক্ষা ব্যবস্থা বিপন্ন হয়ে ওঠে। বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মুসলিম আক্রমণের প্রথম যুগেই সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে, ধীরে ধীরে ভারতের বুক থেকে বৌদ্ধ শিক্ষা

ব্যবস্থা সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যায়। কিন্তুসব বাধা বিঘ্নকে তুচ্ছ করে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থা বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার ধ্বংসের পরও ভারতের জীবন ধারার সাথে ভারতের সমাজ ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে আজও টিকে আছে।

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থারকেন্দ্র টোলগুলি ভারতের সর্বত্র ছড়ান ছিল। ভারতে প্রতি নগরে ও সমৃদ্ধশালী জনপদে টোলের মাধ্যমে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। প্রসিদ্ধ ধর্মস্থানে বহু সংখ্যক টোলের উপস্থিতির ফলে সে স্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি লাভ করেছে। বারানসী ও নদীয়ায় দূরদূরান্ত থেকে শিক্ষার্থীগণ উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য আসত। নিরভিমানী পণ্ডিতগণ জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখে প্রাচীন আদর্শে ও পদ্ধতিতে এই টোলের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্র এই টোল গুলিকে অনেক সময় চতুষ্পাঠীও বলা হত। এগুলিকে চতুষ্পাঠী বলা হত কারণ এখানে চার রকম শাস্ত্র পাঠ হত—ব্যাকরণ শাস্ত্র, নীতি শাস্ত্র, দর্শন শাস্ত্র ও পুরাণ। অধ্যাপক নিজগৃহে ছাত্রদের অধ্যাপনা ছাত্রদের আহার ও বাসস্থানের সংস্থান করতেন। বাংলা দেশে আধুনিক যুগে তিন প্রকারের সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র রয়েছে, প্রথম শ্রেণীর টোলে ব্যাকরণ, কাব্য, পুরাণ ও স্মৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপনা হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর টোলে নীতি শাস্ত্র ও পুরাণের চর্চা হয়। তৃতীয় শ্রেণীর টোলে ন্যায় দর্শনের চর্চা হয়। বর্তমানকালের উচ্চশিক্ষা যেরূপ বক্তৃতাধর্মী টোলের অধ্যাপকগণ সেরূপ বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষা দিতেন না। নির্দিষ্ট একটা অংশ পাঠ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রথমে নির্দিষ্ট পাঠ মুখস্থ করতে হয় তারপর অধ্যাপক সেই অংশের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন। ভারতের প্রায় সর্বত্রই টোল, মঠ বা মন্দিরে ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা দিল। এক একটি টোলে একজন অধ্যাপকের নিকট ১৫।১৬ বিদ্যার্থী শিক্ষা গ্রহণ করত। কোন টোলে বেদ কোথায়ও আবার শুধু ব্যাকরণ, কোথাও কাব্য এমনি ভাবে এক এক টোলে বেদান্ত, ন্যায় দর্শন ও নীতি শাস্ত্র, জ্যোতিষী প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হত। টোলের অধ্যাপকগণ সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে ছিলেন। হিন্দু সমাজের রীতিনীতি, পূজা পার্বন প্রভৃতি বিষয়ে পণ্ডিত সমাজের নির্দেশেই নিয়ন্ত্রিত হত। ভারতে বহু রাজ বংশের উত্থান পতন হয়েছে, বহুশতাব্দী পূর্বে গৌরবময় হিন্দু যুগের অবসান হয়েছে, এই ভাঙ্গা গড়ার মধ্য দিয়ে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার ধারা অব্যাহত চলে এসেছে। টোল ও চতুষ্পাঠীর মধ্যে আজও আমরা প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার রূপটিকে

প্রত্যক্ষ করতে পারি। একটি প্রাচীন জাতির সুমহান শিক্ষা ব্যবস্থাকেই শুধু এই টোল গুলি বাঁচিয়ে রাখেনি সেই অতীত যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান এই প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে বেঁচে রয়েছে।

পরিষদ :—অতি প্রাচীন কালে ভারতে যখন আর্যগণ ধীরে ধীরে বসতি স্থাপন করতে থাকেন তখন থেকেই বৈদিক আর্য সমাজে পরিষদ বলে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। পরিষদ বা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সভা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা সংক্রান্ত সকল সমস্যার ও বিতর্কের মীমাংসা করতেন। পরিষদ অতি প্রাচীন কাল থেকেই আর্য সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আমরা দেখি শ্বেতকেতু পাঞ্চালের একটি পরিষদে উপস্থিত ছিলেন। পরিষদের গঠন পদ্ধতি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপ হত। কোন স্থানে ২১ জন ব্রাহ্মণ নিয়ে পরিষদ গঠিত হত। এঁরা দর্শন, ধর্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে অতি অল্পসংখ্যক পণ্ডিত নিয়েও পরিষদ গঠিত হত। গৌতমের মতে পরিষদে কমপক্ষে দশজন সদস্য থাকবেন এঁদের মধ্যে চারজন হবেন বেদজ্ঞ, যাঁরা চারবেদে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছেন। তিনজন হিন্দু বিধানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পারদর্শী হবেন, অপর তিন জনের ধর্মশাস্ত্র দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকা চাই। বশিষ্ঠ ও বুধায়নের মতে চারজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নিয়েই পরিষদ গঠিত হতে পারে। এঁরা এক একটি বেদ ছাড়া কেউ মীমাংসা, কেউ বেদাঙ্গ, কেউ হিন্দু বিধান সম্পর্কে পারদর্শী হবেন।

বিভিন্ন মতামত পর্যালোচনা করে মনে হয় সাধারণতঃ পরিষদ দশজন পণ্ডিতকে নিয়ে গঠিত হত। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দশজনের কম পণ্ডিত নিয়েও পরিষদ গঠিত হতে পারত। পরাসর বলেছে কোন স্থানে চার অথবা তিনজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নিয়েও পরিষদ গঠিত হতে পারে।

পরিষদ ছিল সেই যুগের বিচার সভা। ধর্ম ও সমাজের সকল জটিল বিষয় এ পরিষদে মীমাংসিত হত। পরিষদগুলির পণ্ডিত সমাজ প্রধানতঃ অধ্যাপকদের নিয়ে গঠিত হবার ফলে দেশের বিভিন্ন পরিষদের সমবায়ে বর্তমান যুগের বিশ্ববিদ্যালয়ের মত এক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। কারণ পরিষদ গঠনে চতুর্বেদ, ধর্মশাস্ত্র দর্শন, ন্যায়, নীতি, মীমাংসা প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রে পারঙ্গম পণ্ডিত ও অধ্যাপকগণ যাতে অংশ গ্রহণ করে সে ব্যবস্থা ছিল। পরিষদে ছাত্রদের ও গ্রহণ করা হত। এমনিভাবে বিভিন্ন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত

অধ্যাপকগণ ও ছাত্র সমাজ যখন কোন স্থানে সম্মিলিত হত তাকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র সংস্করণই বলতে পারি।

এর পরে ১৯৫০ সালের Paper II ৫নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

Q. 6. Estatimate the contributions of the muslim kings in the field of education.

Ans. ১৯৫১ সালের Paper III ২নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

Q. 7. Examine critically Macaulay's minute and trace the subsequent development of English Schools in India.

Ans. ১৯৫১ সালের Paper III ৭নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

Q. 8. Discuss the main recomenandations of the Mudaliar commission, and state to what extent these have been implimented.

Ans. ১৯৫৯ সালের Paper III ৯নং প্রশ্ন এর ১৯৫৭ সালের Paper III ১০নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

B. T. Essay comp. এ 'Review of the report of Secondry Education commission' পড়লে উপকৃত হবেন।

Q. 9. Write critical notes on any two of the following :—

(a) The Hunter Commission 1882.
(b) University Grants Commiseion.
(c) The Abbot-wood Report.

Ans. (a) ১৯৫০ সালের Paper III ৬নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।
(c) ১৯৫৭ সালের Paper III ৮ (iii) প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

Paper III—History of Education

1962

Q. 1. Give a critial estimate of the contributions of Rousseau to modern educations.

Ans. ১৯৫০ সালের Paper III ৩নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

Q. 2. Discuss critically the views of John Dewey on education.

Ans. ১৯৬১ সালের Paper III ২নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

Q. 3. Traece briefly the history of elementary education in England since the passing of Balfour Act of 1902.

Ans. ১৯০২ সালের শিক্ষাবিধি ইংলণ্ডে প্রবর্ত্তিত হবার পর থেকে অনেক উন্নতমানবিশিষ্ট বিদ্যায়তন যেগুলো এতদিন উচ্চতর প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসাবে পরিগণিত হ'তো, সেগুলো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে হ'লো রূপান্তরিত। যে সকল এলিমেণ্টারী বিদ্যালয় প্রাথমিক ও উন্নতমানবিশিষ্ট বিদ্যায়তনের মধ্যগা ছিল সেগুলোর নামকরণ হ'লো উচ্চতর এলিমেণ্টারী স্কুল। এই সময়ে ইংলণ্ডে আর এক ধরণের উচ্চতর এলিমেণ্টারী বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হ'লো যেগুলোকে বলা হ'তো কেন্দ্রীয় বা সেণ্ট্রাল স্কুল। এই বিদ্যালয়গুলোতে সাধারণভাবে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে এগার থেকে চৌদ্দ অথবা পনের বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা যাতে হাতেনাতে কোন কাজ শিখতে পারে, যেমন শিল্পমূলক অথবা ব্যবসায়সংক্রান্ত কোন কাজ, তার বন্দোবস্ত করা হ'লো। এই সময়ে ইংলণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্রে একটি পরিবর্ত্তন সবিশেষ লক্ষ্যণীয়। এগার বা বার বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত ক'রতে হবে এবং তার পর থেকে তাদের প্রাথমিকোত্তর শিক্ষা সুরু হবে।

এর পর ১৯১৪ সালে আর একটি শিক্ষাআইন পাস করা হ'লো বিকলাঙ্গ ও মৃগীরোগগ্রস্ত শিশুদের জন্য। ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনে এই আইনের গুরুত্ব অনেকখানি ; বিকলাঙ্গ ও দুরারোগ্য রোগগ্রস্ত লোক যে কোন সমাজের নিকট এতদিন ভারস্বরূপ ব'লে পরিগণিত হ'তো। তাদেরকে কিছু কিছু লেখাপড়া শিখিয়ে অথবা হাতের কাজ শিখিয়ে স্বাবলম্বী ক'রে তোলার প্রয়াস হ'লো এই

আইনে। এই আইনের বলে বিকলাঙ্গ অথবা দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত বালক-বালিকাদিগের শিক্ষা অভিভাবকদের পক্ষে বাধ্যতামূলক করা হ'লো এবং স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ যাতে এদিকে তাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখে, সে বিষয়ে তাঁদের প্রতি নির্দ্দেশ জারি করা হ'লো।

ঠিক এই সময়ে প্রথম বিশ্বসংগ্রাম বাধলো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধার ফলে নতুন ক'রে আর বিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভব হ'লো না। কারণ, জাতির ঘোরতম দুর্দ্দিনে রাষ্ট্রের সর্ব্বকার্য্যে ব্যয়-সঙ্কোচ একান্তভাবে আবশ্যক। যুদ্ধ-জয়ের দিকে জাতির সর্ব্বপ্রচেষ্টা নিয়োজিত হ'লো। সৈন্যদলে বয়স্ক ও সমর্থ লোক যোগ দেওয়ার ফলে দেশে যোগ্য শিক্ষকের অঘটন ঘটলো। দেশের কয়েকটি বিদ্যালয় রাষ্ট্রের সামরিক বিভাগ ও নৌবিভাগ দখল করে নিল। ইংলণ্ডে শিক্ষার অগ্রগতি অবশ্য সাময়িকভাবে ব্যাহত হ'লো। কিন্তু এই সংগ্রামই আবার ইংরেজদের জাতীয় জীবনে শিক্ষার প্রতি অনুরাগকে গাঢ়তর করে তুললো। সমগ্র জাতি যখন জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত, তখন ইংলণ্ডের জন-সাধারণের মনে দেশে এক উন্নততর শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করার উদগ্র অভিলাষ বলবান হ'য়ে দাঁড়ালো। এই সংগ্রামের ফলে দেশের লোকের মনে শিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে এক ব্যাপক অনুকূল ধারণা বদ্ধমূল হ'য়ে প'ড়ছিল। বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও সাধারণভাবে এই শিক্ষাপদ্ধতি ছিল বহুলাংশে সুষ্ঠু।

এই সময়ে ইংলণ্ডের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন শেফিল্ড্ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ মিঃ ফিশার। তাঁরই উৎসাহে ও অধিনায়কত্বে ইংলণ্ডে শিক্ষাসংগঠনের কাজ এই সময় প্রধানতঃ তিনটি নীতি অনুসরণ ক'রে চ'লছিল। প্রথমতঃ, ইংলণ্ডে শিক্ষকের জীবিকাকে অধিকতর চিত্তাকর্ষক ক'রে তোলা এবং সেই সঙ্গে তাঁর সামাজিক সম্মানে আরো উন্নীত করা; শিক্ষাক্ষেত্রে স্থানীয় অধিবাসী-দের স্বতোৎসারিত প্রেরণাকে উদ্বুদ্ধ করা, আর তৃতীয়তঃ, ইংলণ্ডের স্থানীয় শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষদের দায়িত্ব এবং শক্তিকে বিস্তৃততর ক'রে জাতীয় শিক্ষাধারাকে ক্রমবর্দ্ধমান উন্নতির পথে চালিত করা;

এই সময়কার শিক্ষাপদ্ধতির নানান গুরুতর সমস্যা সরকারী প্রস্তাবাকারে একটি বিলে সংযোজিত হ'লো এবং ১৯১৮ সালে এই বিল আইনে পরিণত হ'লো। ইংলণ্ডের তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী ফিশার সাহেবের নামানুসারেইএ শিক্ষাবিধির নাম হ'লো ফিশার এ্যাক্ট্। নীচে এর প্রধান প্রধান কয়েকটি ধারা লিপিবদ্ধ করা গেল।

(১) ১৯০২ সালের শিক্ষাবিধির দ্বারা যে সকল স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ স্থাপিত হ'য়েছিল, শিক্ষামূলক সমস্ত ব্যাপারে তাঁরাই ব্যবস্থাপক থাকবেন।

(২) স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষগণকে শিক্ষার উন্নতিমূলক প্রসারকল্পে এবং শিক্ষার ব্যাপক সংগঠন উদ্দেশ্যে বোর্ড অব্ এডুকেশনের নিকট নবতম পরিকল্পনা দাখিল করতে বাধ্য থাকতে হবে।

(৩) স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষগণকে উচ্চতর প্রাথমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত ক'রতে হবে।

(৪) চৌদ্দবছর বয়সের ছেলে-মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক হ'বে।

(৫) এতাবৎকাল বিদ্যায়তনগুলিতে যে অর্দ্ধ সময়ের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে, সেই প্রথাকে রহিত ক'রতে হবে।

(৬) দুই থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের শিক্ষার জন্য নার্সারি বিদ্যালয় খোলার জন্য স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষদিগকে নির্দ্দেশ ও শক্তি দেওয়া হ'লো।

(৭) সমস্ত প্রাইভেট্ বিদ্যালয়কে হয় স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের কাছে না হয় বোর্ড অব্ এডুকেশনের কাছে রেজিষ্টার্ড্ হ'তে হবে; অবশ্য এর আগে বোর্ড্ অব্ এডুকেশন অথবা স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ সেই বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শন ক'রবেন।

(৮) ছাত্র-ছাত্রীগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও শারীর শিক্ষার জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা চাই।

(৯) স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষগণকে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা ক'রে যেতে হবে।

১৯১৮ সালের শিক্ষা-আইন ইংলণ্ডের শিক্ষার ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। শিক্ষাকেজনসাধারণের নিকট সহজলভ্য ক'রে তোলাই এবং তাকে জাতিগত সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপনা করাই ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য। এই নীতিকে কার্য্যে পরিণত ক'রতে গেলে কেন্দ্রীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের সহিত স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের সক্রিয় সহযোগিতা একান্তভাবে আবশ্যক। শিক্ষাকে সমাজের সর্ব্বস্তরব্যাপী ক'রে তোলা এবং তাকে প্রগতিশীল প্রসারতার পথে চালিত করবার জন্য বোর্ড্ অব্ এডুকেশন স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের উপর নানাবিধ পরিকল্পনা করার দায়িত্ব দিয়ে দিলেন। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে নিবিড় সহযোগিতা স্থাপন এবং সেই সঙ্গে স্থানীয় শিক্ষাসংস্থা এবং কেন্দ্রীয়

শিক্ষাকর্তৃপক্ষের মধ্যে গভীর যোগাযোগ সংরক্ষণই ছিল ১৯১৮ সালের শিক্ষা-বিধির প্রধানতম উদ্দেশ্য। ইংলণ্ডের যে সব ছাত্রছাত্রী হয়তো কোনদিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পাবে না, তাদের জন্য বিদ্যালয়ত্যাগের বয়সের সীমাকে বাড়িয়ে চৌদ্দ বছর পর্য্যন্ত নিয়ে যাওয়া হ'য়েছিল। এই সীমাকে আরও বাড়িয়ে কিশোর কিশোরীদের শিক্ষার সুব্যবস্থা করার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল ফিশার এ্যাক্টে। এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে লোকের মনে নবতম ভাবধারার উদ্ভব হ'লো। সেই সঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যায়তনগুলোকে সুসংহত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হ'তে লাগলো। প্রাথমিক শিক্ষা এবং প্রাথমিকোত্তর শিক্ষা বলতে কি বুঝায় তার যথাযথ সংজ্ঞার নির্দ্দেশ ছিল এই বিধিতে। এই আইনে ব'লে দেওয়া হ'লো যে নার্সারি, ইনফ্যান্ট্ আর জুনিয়র স্কুলে তিন থেকে এগার বছর বয়সের শিশুদের যে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তাকে বলা হবে প্রাথমিক শিক্ষা; আর বার থেকে আঠার বছর বয়সের ছেলে-মেয়েদের জন্য যে শিক্ষা চালু থাকবে তাকে বলা হবে মাধ্যমিক বা প্রাথমিকোত্তর শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রের এতদিন সে যুগ্ম-নিয়ন্ত্রণপদ্ধতি বলবৎ ছিল, সেটাই চ'লতে লাগলো—অর্থাৎ স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ এবং বোর্ড অব্ এডুকেশন সম্মিলিতভাবে প্রাথমিক শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করে যেতে লাগলেন। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে স্বৈচ্ছিক প্রচেষ্টার সীমা দিন দিন সঙ্কীর্ণ হ'য়ে আসছিল। এর কারণ হ'লো এই যে বিদ্যালয়ে আবশ্যিক অধিষ্ঠানের সময় বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে ভলানটারী বিদ্যালয়গুলোতে অধিকতর শ্রেণী খোলার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু অর্থের অপ্রতুলতাহেতু এই সব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সেগুলো করা সম্ভব হয় নি। এর ওপর শিক্ষা দিন দিন ব্যয়বহুল হ'য়ে উঠছিল। শিক্ষা সংগঠন ব্যাপারে যে সব পরিবর্ত্তন সংসাধিত হ'য়েছিল তাতে স্বৈচ্ছিক সংস্থাগুলোর খুব অসুবিধা হ'চ্ছিল। ১৯১৮ সালের শিক্ষাবিধি অবশ্য ধর্ম্মশিক্ষাব্যাপারে ছিল একেবারে নীরব। ছাত্রছাত্রীদের বয়ঃসন্ধিক্ষণে কিছু কিছু ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন এই ছিল সেই সময়কার জনসাধারণের বিশ্বাস।

নানাবিধ পরীক্ষা ও সংস্কারের অধ্যায় :—(১৯১৮-১৯৪৪) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি আর দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের সূচনার মধ্যে ইংলণ্ডে শিক্ষার ইতিহাসে নানা রকমের পরীক্ষামূলক ক্রিয়াকর্ম্ম চালানো হ'য়েছে এবং সেই সঙ্গে শিক্ষা-ক্ষেত্রে নানাবিধ সংস্কারও প্রবর্ত্তিত হ'য়েছে। যুগোপযোগী প্রয়োজনীয়তানুসারে এই পরিবর্ত্তনের ধারার পথ ছিল অতিশয় সতর্ক ও বিবেচনাসাপেক্ষ এবং এর

গতি ছিল ক্রমিক ও মন্থর। এই অধ্যায়েই ইংলণ্ডের শিক্ষাধারা গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর সংস্থাপিত হ'য়েছিল।

প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা অর্থাৎ নার্সারি ও ইন্ফ্যান্ট্ বিদ্যালয়ের শিক্ষাবিষয়ের আন্দোলন জন-সাধারণের অধিকতর সমর্থন-লাভ ক'রছিল। অনগ্রসর এবং বিকলাঙ্গ শিশুরা তাদের উপযোগী শিক্ষা পাচ্ছিল। ডলটনপ্রথা, প্রোজেক্ট-পদ্ধতি, কিণ্ডারগার্টেন ও মণ্টেসরি শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে ইংলণ্ডে নানা ধরণের পরীক্ষামূলক গবেষণা চ'লতে লাগল ও বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিকে সুচিন্তিত মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য প্রয়াস চ'লতে লাগল। বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকার সঙ্কীর্ণ সীমাকে করা হ'লো বিস্তৃততর। শাস্তি দেবার মনস্তত্বসম্মত নীতি অনুসৃত হ'তে লাগল প্রতিটি বিদ্যালয়ে। পাঠ্য-বহির্ভূত ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের দেহ মনের যাতে সুসমঞ্জস বিকাশ হয়, সেদিকে ইংলণ্ডের শিক্ষাবিদ্‌গণ সবিশেষ যত্নপর হ'য়ে উঠলেন। বিদ্যালয়-গুলোতে শিক্ষকনিয়োগ, শিক্ষালয়ে ছাত্রছাত্রীগণের জন্য স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি, পাঠদান সময়ে বিদ্যালয়ে যথোপযুক্ত নিদর্শনাদির ব্যবস্থা এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা বিষয়ে নানাবিধ সুচিন্তিত সংস্কার প্রবর্ত্তিত হ'লো।

১৯২১ সালে ইংলণ্ডে একটি শিক্ষা-আইন বিধিবদ্ধ হ'লো যার ফলে এর আগের অন্যান্য প্রায় ত্রিশটি শিক্ষাবিধিকে সুসংবদ্ধ করা হ'য়েছিল। ১৯২৬ সালে যে নিউ কোড্ পাশ হ'য়েছিল তাতে প্রয়োজনীয় সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তন ও সংস্কার সংসাধিত হ'লো। ১৯৪১ সালে যে শিক্ষা আইন প্রবর্ত্তিত হ'য়েছিল তাতে জনসংখ্যা ও বিশেষ বিশেষ এলাকার সীমানুযায়ী ইংলণ্ডে স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের সংখ্যাকে বেঁধে দেওয়া হ'লো। ১৯৩৬ সালে যে শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হ'লো তাতে স্থির হয় যে ১৯৩৯ সালের মধ্যে ইংলণ্ডে বিদ্যালয়গামী বালক-বালিকাদের বিদ্যায়তনের অবস্থানকালকে পনের বৎসর পর্য্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হ'লো।

এই সময় বোর্ড অব এডুকেশনের পরামর্শদাতা সমিতির সভাপতি স্যার হেনরি হাডো প্রাথমিক ও প্রাথমিকোত্তর শিক্ষাসম্বন্ধে এক রিপোর্ট বার করেন। এই রিপোর্ট দাখিল করা হয়। এতে প্রাথমিক ও প্রাথমিকোত্তর শিক্ষার সূচনা ও সমাপ্তি বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত তিনি প্রকাশ করেন। ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষার সম্পূর্ণ পুনর্গঠনের জন্য তিনি কয়েকটি সুপারিশও ক'রেছিলেন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীকে বাদ দিয়ে নানাবিধ প্রাথমিক বিদ্যালয় কি উদ্দেশ্য নিয়ে পরিচালিত হবে, সেখানকার

ব্যবস্থাপনা এবং সংগঠনই বা হবে কি প্রকার, সেখানে যোগদানকারী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কি ধরণের পাঠ্যসূচীই বা অনুসৃত হবে ইত্যাদি আনুষঙ্গিক ব্যাপার এই রিপোর্টে বিশেষভাবে আলোচিত হ'য়েছিল। হ্যাডো রিপোর্টে যে যে বিষয়ে সুপারিশ করা হ'য়েছিল, তা নীচে তালিকাভুক্ত করা হ'লো।

(১) প্রাথমিক শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটবে ছাত্রছাত্রীদের একাদশ বা একাদশোত্তর বছর বয়সের সময়। এই বয়সান্তে তারা কোন না কোন প্রকার প্রাথমিকোত্তর বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত হ'তে পারবে।

(২) ঠিক এগার বছর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থার নাম হ'বে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং এই বয়সের বেশী বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য যে শিক্ষা চালু থাকবে, তার নাম হবে প্রাথমিকোত্তর বা মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা।

(৩) এই মাধ্যমিক শিক্ষাই আবার কোন কোন বালকবালিকার ষোল থেকে সতের বৎসরের মধ্যে শেষ হবে। আবার কারো কারো বেলায় তা শেষ হবে তাদের আঠার বা উনিশ বৎসর বয়সের সময়। কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর বেলায় এই মাধ্যমিক শিক্ষা ১৪+ থেকে ১৫+ বয়সের মধ্যে সম্পূর্ণ হ'য়ে যাবে।

(৪) ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিকোত্তর অধ্যায়ে এমনতর শিক্ষা ব্যবস্থা ক'রতে হবে যাতে সে শিক্ষা ছাত্রছাত্রীর অভিরুচি, মানসিক প্রবণতা ও সর্ব্বোপরি তাদের সামর্থ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়। উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে হাতেনাতে কাজ করার প্রতি একটি মর্য্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে।

(৫) ১১+ বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্রছাত্রীকে মাধ্যমিক বা অনুরূপ কোন বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত ক'রতে হবে। যারা অবশ্য মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করবার অনুপযুক্ত হবে তাদের জন্য অন্য রকম ব্যবস্থা ক'রতে হবে।

ইংলণ্ডের শিক্ষাধারা যখন অন্ধকারে পথ হারিয়ে লক্ষ্যহীন হ'য়ে ঘুরে ম'রছিল তখন সেই ঘনান্ধকারের মধ্যে আলোর দীপবর্ত্তিকা তুলে ধ'রলো এই হ্যাডো রিপোর্ট। শিক্ষাসংগঠন ব্যাপারে অনেকখানি আলোক-সম্পাত ক'রেছে এই রিপোর্ট। প্রাথমিক শিক্ষার সর্ব্ব বিভাগে যাতে উন্নতি হয়, সে বিষয়ে হ্যাডো রিপোর্টে বহু সুচিন্তিত যুক্তির অবতারণা করা হ'য়েছে। বর্ত্তমানের মনস্তত্ব-মূলক শিক্ষার নীতি অনুযায়ী এই রিপোর্টের সুপারিশগুলো করা হ'য়েছিল।

কিন্তু ইংলণ্ডের দুর্ভাগ্যের বিষয় ব'লতে হবে যে হ্যাডো রিপোর্টকে কার্য্যকরী করা গেল না। ১৯৩৯ সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্বসমর বাধলো, তখন ইংলণ্ডে শিক্ষার সর্ব্বস্তরের অগ্রগতি বহুলাংশে ব্যাহত হ'য়ে গেল।

যুদ্ধজনিত খাদ্যসঙ্কোচহেতু খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদ এলো। বিদ্যালয় প্রাঙ্গন ও উদ্যান কৃষিভূমিতে রূপান্তরিত হ'লো। বিদ্যালয়ের কৃষিভূমি বা ছাত্রছাত্রীদের শ্রেণীকক্ষস্বরূপ এবং গৃহবহির্ভূত ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্র। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের মাঠে কাজে কর্মে নানাভাবে সাহায্য ক'রতে লাগল। যুধ্যমান সৈনিকগণের জন্য ছাত্রছাত্রীরা ব্যাণ্ডেজ, স্ক্রীন, মোজা, পরিধেয় বস্ত্র ইত্যাদি তৈরী ক'রতে লাগলো। যুদ্ধকালীন নার্সারী বিদ্যালয়গুলির জন্য বিদ্যালয়ের কারখানায় নানাবিধ পুতুল ও খেলনা প্রস্তুত হ'তে লাগলো। যুদ্ধকালীন অভিযান চালানোর জন্য বিদ্যালয়ের চিত্র-শ্রেণীতে নানাবিধ পোষ্টার অঙ্কিত হ'তে লাগলো; গৃহহারা ছাত্রছাত্রীরা শিখলো কাপড় চোপর কাচতে, ইস্ত্রী করতে, জুতো সেলাই করতে, নিজেদের খাদ্য রাঁধতে, স্থানীয় শিল্প শিখতে, নতুন জায়গায় পুংখানুপুংখ বিবরণ দিতে এবং স্থানীয় জীবনের সর্ব্ববিভাগের প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ ক'রতে। যুদ্ধের সময় বিদ্যালয়ের বালকবালিকাদের মধ্যে দুগ্ধ, বিতরণও খাদ্য বিতরণ পদ্ধতিকে বিস্তৃততর করা হ'লো। দেখা গেল, ১৯৪৭ সালের মধ্যে সরকারী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণের শতকরা নব্বইজন বিদ্যালয়েই দুধ খাচ্ছে এবং শতকরা পঞ্চাশজনের বিদ্যালয়েই তাদের মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে নিচ্ছে। যুদ্ধের পরেও দেখা গেছে যে বহু বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের ডিনারের জন্য যে পরিমান শাক-সব্জীর প্রয়োজন, তা সবই উৎপন্ন হ'চ্ছে বিদ্যালয়ের উদ্যানে। ক্যাম্প্ স্কুলগুলোর মাধ্যমে ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনে একটি পরম লাভ হ'লো, তা হ'লো এই যে সহযোগীতামূলক ও সামাজিক মনোভাব নিয়ে কাজ করবার অভিলাষ ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে উদ্বুদ্ধ হ'তে লাগলো।

সমগ্র জাতি যখন মহামৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, জার্মাণীর বোমারু বিমানের আক্রমনে ইংলণ্ড যখন একেবারে পর্যুদস্ত, জাতির সেই ঘোরতর দুদ্দিন ইংলণ্ডের মণীষীরা নিরলস হ'য়ে ব'সে ছিলেন না। বহু অতন্দ্র রজনী তাঁদের অতিবাহিত হ'য়েছে এমন এক অভিনব পন্থা বার ক'রতে যা দিয়ে সমগ্র জাতিকে তারা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারবে। জাতির মণীষীরা বুঝেছিলেন তাঁদের দেশের শিক্ষাধারার মধ্যে এমন কতকগুলো

গলতি র'য়েছে যেগুলোর আশু প্রতিবিধান প্রয়োজন। তাই দেশের এই সঙ্কটসঙ্কুল অবস্থার মধ্যেও দেশের চিন্তাশীল মণীষীরা দেশের শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তনসাধন ক'রলেন। ১৯৪৪ সালে আর এক শিক্ষা-আইন বিধিবদ্ধ হ'লো। লর্ড বাটলার ছিলেন এই বিধির নিয়ামক; তাই এই বিধিকে বলা হয় বাটলার এ্যাক্ট্। ১৯৪৪ সালের শিক্ষা বিধি ইংলণ্ডের শিক্ষা ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। যুদ্ধজনিত সঙ্কটময় অবস্থা ও যুদ্ধোত্তরকালে পরিবর্ত্তিত সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে সমান তাল রেখে ১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধি ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থার সর্ব্বস্তরে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন আনার চেষ্টা ক'রলো। বিদ্যালয় যাবার আবশ্যিক বয়সের সীমা বাড়িয়ে দেওয়া হ'লো, অর্থাৎ, তাকে পনেরোয় ঠেলে দেওয়া হ'লো। নার্সারি শিক্ষার সন্তোষজনক সুব্যবস্থা হ'লো। বিদ্যালয়ে যাবার আবশ্যিক বয়সের পরও ছাত্রছাত্রীরা যাতে অধিকতর শিক্ষালাভ ক'রতে পারে, যাতে তারা হাতেনাতে কাজ শিখতে পারে তারও ব্যবস্থা করা হ'লো। ইংরেজ জাতির আবালবৃদ্ধবনিতার সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হ'লো এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে। যে শিক্ষাপদ্ধতি এখন থেকে ইংলণ্ডে চালু করা হ'লো তা হ'লো একান্তভাবে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। এই শিক্ষা ব্যবস্থা এমন ব্যাপক হ'লো, যে কোন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীই এর প্রভাব থেকে বাদ প'ড়লো না। বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীর সামর্থ্য, বয়স মানসিক প্রবণতা ও রুচি অনুযায়ী শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হ'লো। ইংলণ্ডে এবং ওয়েল্‌সে ১১+ বয়স পর্য্যন্ত বালকবালিকারা প্রাথমিক শিক্ষা পাবে; আর স্কটল্যাণ্ডের ছেলেমেয়েদের বেলায় সেই বয়স হবে ১২+। দুই থেকে পাঁচ বছর বয়সের শিশুদের জন্য বহুসংখ্যক নার্সারি বিদ্যালয় খোলা হ'লো। ৫ থেকে ৭ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য ইন্‌ফ্যাণ্ট্ স্কুল স্থাপিত হ'লো। ৭ বছর বয়সের বেশী ছাত্রছাত্রীদের জন্য জুনিয়র স্কুল হ'লো স্থাপিত। গ্রেট ব্রিটেনে ৫ থেকে ১৫ বৎসরের শিশু ও বালকবালিকাদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হ'লো; সামগ্রিকভাবে। যে মাধ্যমিক শিক্ষা ১১+এ শুরু হবে, তা চলবে ১৫ বছর পর্য্যন্ত। এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সেই শিক্ষা স্থায়ী হবে আঠার বছর পর্য্যন্ত। এর পরই হবে অধিকতর শিক্ষার গোড়াপত্তন। অধিকতর শিক্ষা অবশ্য হবে সারা জীবনব্যাপী। পাঁচ বছরের আগে আর পনের বছরের পরে বা শিশু বালকবালিকাদের শিক্ষা হবে মুখ্যতঃ স্বেচ্ছিক। ১৯৪৪ সালের পর থেকে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে কয় বছর অতিবাহিত হ'য়েছে সেই সময়ের মধ্যে

ইংলণ্ডের শিক্ষাপদ্ধতি এই বিধির ওপর ভিত্তি ক'রে পুর্ণসংগঠনের মধ্য দিয়ে দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হ'চ্ছে। সর্ব্ব বয়সের মানুষের জন্য ও সর্ব্ব রুচির লোকের জন্য শিক্ষার সুযোগকে করা হ'য়েছে বিস্তৃত। বিদ্যালয়গমনের বাধ্যতামূলক বয়সকে বড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পনের বছর পর্য্যন্ত।

Q. 4. Make general survey of the developement of Secondary Education from the Bryce commission to the time of spen's report.

Ans. ১৯৫৭ সালের Paper III ৩নং প্রশ্ন, ১৯৫০ সালের Paper III ১০নং প্রশ্ন ও ১৯৫৫ সালের Paper III ৩নং প্রশ্ন এবং নীচের অংশযোগ করুন।

বিদ্যায়তনের সংগঠন এবং পারস্পরিক সম্পর্কে নির্ণয়ের জন্য মিঃ উইলিয়ম স্পেন্সের অধিনায়কত্বে বোর্ডের পরামর্শদানকারী সমিতিকে অনুরোধ জানানো হ'লো শিক্ষাপর্ষদের পক্ষ থেকে। ইংলণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষার তদানীন্তন অবস্থা এবং তার উন্নতির জন্য স্পেন্স্ রিপোর্ট কয়েকটি প্রস্তাব ও সুপারিশ করে'ছিল। নীচে কয়েকটি সুপারিশ লিপিবদ্ধ হ'লো :—

১। ইংলণ্ডের আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দেশের বর্ত্তমান মাধ্যমিক শিক্ষাধারাকে চ'লতে হবে।

২। মাধ্যমিক বিদ্যায়তনের শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা, চিকিৎসা, ক্রীড়াকৌতুক ও শারীরিক ব্যায়ামের যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হবে বিকাশোন্মুখ কিশোর কিশোরীদের জন্য এমনতর শিক্ষাব্যবস্থা করা যাতে তাদের বয়সের ও মনের একান্ত উপযোগী হয় এবং যা দিয়ে তাদের মধ্যে নানা রকমের সুপ্ত সম্ভবনাকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলা যায়।

৪। বিদ্যায়তনগুলির পাঠ্যসূচী হবে কর্ম্মকেন্দ্রিক। শুধু জ্ঞানার্জ্জনই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হবে না। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা হ'য়ে উঠবে অল্পায়াস-লভ্য। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠসূচী যেন জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে নিবিড় যোগ রক্ষা ক'রে চলে। বিভিন্ন প্রবণতাবিশিষ্ট বিদ্যার্থীদের জন্য যেন পঠিতব্য বিষয়ের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়; অর্থাৎ

মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে এমন সব বিষয় পড়াবার ব্যবস্থা থাকবে যা দিয়ে ভিন্ন রুচির ও ভিন্ন প্রবণতার শিক্ষার্থীদের দাবী মেটানো যেতে পারে।

৫। শিক্ষার্থীদের ভাবগত জীবনের দিকে বেশী জোর দিতে হবে। সুকুমার সলিত কলা এবং সঙ্গীত মাধ্যমিক শিক্ষায়তনের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। এই সব শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্য দিয়ে বিদ্যার্থীদের মধ্যে যে সুপ্ত সৌন্দর্যানুভূতি র'য়েছে তা আপনা হ'তেই কুসুমিত হ'য়ে উঠবে।

৬। মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কোন একটি বিশেষ বৃত্তিতে দক্ষতা অর্জন ক'রতে হবে ছাত্রছাত্রীগণকে হাতেনাতে কোন কাজ শেখার মধ্য দিয়ে। এ হেন শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হবে। কিন্তু কোন বিশেষ বৃত্তিতে বিশেষ পারদর্শিতা বা ব্যুৎপত্তিলাভের কথা মাধ্যমিক শিক্ষার গোড়ার দিকে উঠবে না ; তার প্রশ্ন তোলা যেতে পারে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনের সময়ে।

৭। যুগপৎভাবে সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষাদানের জন্য ১১+থেকে ১৬+বয়সের বিদ্যার্থীদের জন্য টেক্‌নিক্যাল্ স্কুল স্থাপন ক'রতে হবে। এই সব বিদ্যায়তনগুলিকে অন্যান্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমান কৌলীন্য ও পদমর্যাদা দিতে হবে।

৮। টেক্‌নিক্যাল্ হাইস্কুলগুলোর সঙ্গে অন্যান্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের যেন নিয়মিত সম্পর্ক থাকে, যাতে সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের যে সব শিক্ষার্থী টেক্‌নিক্যাল্ হাই স্কুলে যেতে চায়, তাদের স্থানান্তকরণ অতি সুগম হয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রাম বাধার জন্য স্পেন্স রিপোর্টের সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত সুপারিশগুলোকে বাস্তবে রূপায়িত করা গেল না।

Q. 5. Discuss the main features of the Budhistic system of education, as distinguished from the Brahmanic system.

II ২নং প্র.. -া।

Q. 6. Comment on the orientalists and occidentalist contro-versey in education during the first half of the last century, and discuss critically the resolution issued in this connection by the government of India.

Ans. ১৯৫১ সালের ৭নং প্রশ্ন ও ১৯৫৬ সালের ৮নং প্রশ্নের সংশ্লিষ্ট অংশ দ্রষ্টব্য।

Q. 7. Bring out the Salient features of the Wood's Despatch of 1854, and indicate to what extent this despatch was effective in establishing a comprehensive and co-ordinated system of education in India.

Ans. ১৯৫৩ সালের Paper III ৪নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

Q. 8. Give an account of the present position of Secondary education in West Bengal.

Ans. ১৯৫৮ সালের Paper III ১০নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

Q. 9. What were the recommandations of the Calcutta University commission? Give a brief account of the organisation, administrations of Calcutta University.

Aus. ১৯৫৭ সালের Paper III ৯নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

Paper IV—General Methods, School Organisation, School Hygiene
1961

Answer Question No 1. and any four from the rest.

Q. 1. "The medical inspection of school children is of little or no importance unless proper follow up work is undertaken.

Ans. হাইজীন অংশ দ্রষ্টব্য।

or,

Write notes on any two of the following.

(a) A reasonable scheme of mid-day tiffin in a school.

(b) Functions of teachers with reference to the maintenance of good healh of school children.

(c) Personal Hygiene.

Ans. (a) হাইজীন অংশ দ্রষ্টব্য।

(b) হাইজীন অংশ দ্রষ্টব্য।

(c) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য (Personal hygiene)

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের লক্ষণ

১। শুধু দেহ নীরোগ থাকলেই সে স্বাস্থ্য ভাল হ'বে এরূপ ধারণা ঠিক নয়। বস্তুতঃ পক্ষে স্বাস্থ্যের লক্ষণ হ'চ্ছে আমাদের শারীরিক, মানসিক, এবং আত্মিক শক্তির পূর্ণতা লাভ। দেহ হ'বে সুগঠিত, সুদৃঢ়, লাবণ্যযুক্ত, বলিষ্ঠ, ও সুপুষ্ঠ। মন হ'বে প্রফুল্ল, উৎসাহিত, সতেজ। জীবনের গতি হ'বে স্বচ্ছন্দ, রোগহীন। শরীরের অভ্যন্তরের যন্ত্রগুলোর কাজ চলবে স্বাভাবিক ভাবে। পরিমিত দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রমে আমাদের আসবেনা ক্লান্তি। অর্থাৎ দেহ থাকবে কাজের উপযুক্ত। (দেহের এই অবস্থা বজায় রাখতে হ'লে ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত নিয়মাবলী মেনে চলতে হ'বে। Sir Geoge Newman বলেন দেহের সুস্থ অবস্থার জন্য প্রয়োজন "পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, বিশুদ্ধ বায়ু, সূর্য্যের আলো, খাদ্য, ব্যয়াম, বিশ্রাম।"

পরিচ্ছন্নতা :—'চিন্তায় ও কার্যে পরিচ্ছন্ন থাকবে।' শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষার মূল কারণই হচ্ছে পরিচ্ছন্ন থাকা। দেহের প্রত্যেক অংশ এবং পরিপার্শ্ব পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। অলসতার জন্য ছেলেদের স্বাস্থ্যনীতি বিরুদ্ধ কতগুলো কু-অভ্যাস গঠিত হয় যার ফলে তারা ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে শুধু নিজেদের স্বাস্থ্যই ক্ষুন্ন করেনা সমাজের ও ক্ষতিসাধন করে। কাজেই শৈশব হ'তেই অলসতা পরিত্যাগ করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস করা দরকার।

মুখগহ্বর :—প্রতিদিন খাবার পূর্বে ও পরে ভাল করে মুখ ধোওয়া প্রয়োজন, মুখ পরিষ্কার না থাকলে মুখে দুর্গন্ধ হয় মুখের ভেতর এবং জিহ্ব ঘা হয়। দুর্গন্ধ যুক্ত মুখে কাহারও কাছে গেলে বা অপরের সাথে কথা বল্‌লে তা'র বিরক্তির কারণ হ'বে। প্রত্যহ শোয়ার আগে বা ভোরে ঘুম হ'তে উঠে ঠাণ্ডা জলে ভাল করে মুখ পরিষ্কার করা উচিত।

দাঁত :—'দাঁত থাকতে দাঁতের মর্য্যাদা বোঝে না' বাস্তবিক দাঁতের অবহেলায় শুধু দাঁত ই নষ্ট হয় না, এর গোড়াতে যদি খাদ্য কণিকাগুলো জমতে থাকে তা হ'লে সেগুলো পচে এক প্রকার অম্ল রসের সৃষ্টি হয় তার ফলে দাঁতের গোড়ায় শক্ত পাথুরী জন্মায় এবং মাড়ী ফুলে আলগা হয়ে যায়, তা'তে পুঁজ হয়। এই অবস্থাকে পাইওরিয়া বলে। এই পুঁজ রক্ত ভুক্ত দ্রব্যের সাথে পাকস্থলীতে গিয়ে হজম কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটায় পরিনামে, ডিসপেপ্‌সিয়া, অজীর্ণ প্রভৃতি নানারূপ যান্ত্রিক রোগের সৃষ্টি হয়। দাঁতগুলো ও নড়িতে থাকে, ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তখন দাঁত তুলে ফেলা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকেনা দাঁতের যত্ন নিলেই এসব উপসর্গ হ'তে রক্ষা পাওয়া যায়। প্রত্যহ অন্ততঃ শোবার পূর্ব্বে এবং সকালে দাঁত মেজে পরিষ্কার রাখা দরকার। নিম, ভেরেণ্ডা'র ডাল, টুথব্রাস ও পেষ্ট (paste) ব্যবহার করতে হ'লে, ব্রাস নরম হওয়া দরকার, শক্ত ব্রাস ব্যবহারে দাঁত ক্ষয় হয়ে যায় এবং পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ব্রাস ব্যবহারের আর এক মস্ত অসুবিধে হ'চ্ছে যে উহাকে জীবাণুশূন্য করে পরিষ্কার রাখা কষ্টকর কাজেই এক মাসের বেশী একটি ব্রাস ব্যবহার করা উচিত নয়। অনেকে দাঁতের মাজন ব্যবহার করে থাকেন। মিহি চা-খড়ির সাথে সামান্য কর্পূর মিশিয়ে দাঁতের মাজন প্রস্তুত করা যায়। গুপারী পোড়া, হরিতকী, দারুচিনি, গুড়িয়ে ছেঁকে ও উৎকৃষ্ট মাজন তৈরী হয়। মাজন ব্যবহার করলে আঙ্গুল দ্বারা ভাল করে দাঁতের ভেতর ও বা'র ঘষতে হয় ও ভাল করে মুখ ধুয়ে ফেলতে হবে। দাঁত শক্ত রাখবার জন্য কিছু পরিমাণ কঠিন খাদ্য দ্রব্য প্রত্যহ ভাল করে চিবিয়ে খাওয়া দরকার। যথেষ্ট যত্ন নেওয়ার অভাবে

শিশুরাও অনেক সময় পোকা ধরা দাঁতে (carious teeth) কষ্ট পেয়ে থাকে। এদের দাঁত অবহেলা করে অনেক অভিভাবক হয়ত এ মনে করে থাকেন যে শিশুদের দুধে দাঁত পড়ে যাবে—কিন্তু পোকা-ধরা দুধে দাঁত তাহার নীচে স্থায়ী দাঁতকেও আক্রান্ত করতে পারে। কাজেই শিশুদের দাঁতের প্রতিও যথোচিত যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।

চুল :—প্রতিদিন চিরুনী দ্বারা চুল আচড়ান দরকার, যাতে চুলের গোড়ায় মরামাস বা খুনকি জন্মাতে না পারে। চুল পরিষ্কার না থাকলে তেল জল মরামাসে মিশে চুলের গোড়ায় ময়লা জমে, জট পাকিয়ে যায়, এবং উকুন জন্মায়। উকুন একবার মাথায় বাঁসা বাঁধলে সহজে এদের বিনষ্ট করা যায় না, মাথার রক্ত চুষে এরা বেঁচে থাকে। মাথার চামড়া ছিদ্র করে রক্ত চোষবার কালে এরা একপ্রকার বিষাক্ত রস নিঃসরণ করে যার জন্য মাথা অত্যন্ত চুলকায়। এই বিষের দরুণ চামড়ায় ঘা হ'য়ে যায়। সময়ে ঘাড়ের পেছনে লসিকা গ্রন্থি ও এই বিষক্রিয়ার ফলে ফুলে যেতে পারে, স্ত্রী উকুনগুলো ৯ দিন পরেই ডিম পাড়তে আরম্ভ করে এবং ১ মাসে প্রায় ৩০০ ডিম (লিক) পাড়ে। ডি, ডি. টি, মিশ্রিত চুলের লোশন দ্বারা এবং বেনজিল্ বেনজয়েট (Benzl Benzoate) দ্বারা উকুন ও লিক ধ্বংস করা যায়।

নখ :—উপত্বকের বৃদ্ধি হয়ে ভাঁজ পরার ফলে নখের বৃদ্ধি হয়। নখের ভেতর ময়লা ঢুকে থাকলে, খাবার সময় ময়লা পাকস্থলীতে যায় ও পেটের রোগ সৃষ্টি করে। নখ সব সময় পরিষ্কার রাখা দরকার। নখ বড় হ'লেই ময়লা জমিবার আশংখা থাকে। সপ্তাহে অন্ততঃ একবার ছোট করে নখ কাটা খুবই আবশ্যক।

চর্ম :—বাতাস ও ধূলোর দ্বারা উপত্বকে রোগের বীজাণু ভেসে আসে। কিন্তু চর্ম বীজাণুর ভিতরে প্রবেশ প্রতিরোধ করে। পরিষ্কার থাকলে চর্ম কিছু বীজাণু হয়ত ধ্বংস করেও ফেলে কিন্তু অপরিস্কৃত চর্মের, বীজাণু ধ্বংসের ক্ষমতা থাকেনা। কাজেই চর্মের কার্য্য সঠিক চলবার জন্য একে নিয়মিত পরিষ্কার রাখা দরকার। চর্ম দ্বারা অনবরত ঘর্ম নিসৃত হ'চ্ছে। এবং ধূলো ও ঘামে মিশে শরীরের উপর প্রতিনিয়ত ময়লার স্তর জমতে থাকে প্রতিদিন স্নানের সময় ভাল করে গা ঘসে এই ময়লার স্তর পরিষ্কার করা উচিত। কয়দিন স্নান না করলেই এই ময়লা স্তর হ'তে দুর্গন্ধ বের হয় এবং খোস, পাঁচরা, ছুলী, প্রভৃতি নানারকম চর্ম রোগ হয়।

স্নান :—শরীর পরিষ্কার রাখার জন্য প্রত্যহ স্নানের অভ্যাস করতে হ'বে।

আমাদের গরমদেশে স্নাণ আরামপ্রদ কাজেই শিশুদের স্নানের অভ্যাস করান কষ্টকর নয়। ভাল করে গা না মেজে স্নান করলে এর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। নদীতে বা বিশুদ্ধ জলের পুকুরে স্নান করলে শরীর স্নিগ্ধ হয় ও স্বাস্থ্য ভাল থাকে। সহরে কলের জল ছাড়া স্নানের উপায় না থাকলে যথা সম্ভব পর্যাপ্ত জল দিয়ে গা ভাল করে পরিষ্কার করে স্নান করা উচিত। স্কুলে ও স্নানের ব্যবস্থা থাকা দরকার। ব্যায়াম ও খেলার পর প্রথমতঃ ইষৎ উষ্ণ জলে গা ধুয়ে পরিষ্কার করে পরে ঠাণ্ডা জলে স্নান করা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল এবং স্নানের পর জামা গা'য়ে দিলে আর ঠাণ্ডা লাগার আশঙ্কা থাকেনা।

বিদ্যালয়ে শিক্ষক ছাত্র ও অভিভাবকের পরস্পর সহযোগীতায়ই ছাত্রদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস সহজ সাধ্য হয়। শুধু নিজের শরীর পরিষ্কার থাকলেই রোগের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না পরিপার্শ্ব পরিষ্কার রাখা দরকার। পরিচ্ছন্ন আবেষ্টনীতে শিশু থাকতে অভ্যস্ত হ'লে সে নিজেও তা'র পরিপার্শ্ব পরিষ্কার রাখতে সচেতন থাকবে। এ বিষয়ে স্কুল ও বাড়ীর প্রভাব অত্যন্ত বেশী। স্কুল ঘর, মাঠ, প্রস্রাবাগার, পায়খানা সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা দরকার। ছাত্রগণ যাতে এর যথোচিত ব্যবহার করে এ বিষয়ে শিক্ষকের দৃষ্টি থাকবে। কোনও ছাত্রের যদি অপরিষ্কার থাকার বা পরিপার্শ্ব অপরিষ্কার করার কু-অভ্যাস থাকে, তবে তার অভিভাবকের সাথে সংযোগ সাধন করে এ সম্বন্ধে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হ'বে।

পরিচ্ছন্নতার জন্য ছেলেদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলোতে অভ্যস্ত হ'তে হ'বে।

(১) চুল, দাঁত, নখ, চামড়া পরিষ্কার থাকবে। প্রতিদিন কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখবে। পরিধেয় বস্ত্র পরিচ্ছন্ন রাখবে। রাত্রে শোবার সময় দিনের পরিধেয় বস্ত্র ত্যাগ করে অন্য কোন হাল্কা বস্ত্র পরে শয়ন করবে।

(২) খাবার সময় হাত মুখ ভাল করে ধুয়ে নিতে হ'বে। পরিচ্ছন্ন খাদ্য, বিশুদ্ধ জল, ও দুধ পান করতে হ'বে।

(৩) বিশুদ্ধ বাতাস গ্রহণের উপকারিতা, ধূলো ও 'ধোয়া'র অপকারিতা সম্বন্ধে সচেতন থাকবে।

(৪) বাড়ী ঘর পরিষ্কার রাখার আবশ্যকতা এবং স্বাস্থ্যের উপর এর প্রভাব জেনে বাসস্থান পরিষ্কার রাখবে।

(৫) ঘরের কাছে রাস্তায় আবর্জনা জমে থাকলে সেগুলো পরিষ্কার করাবার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।

Q. 2. What are the different ways in which the art of

questioning can be employed ? How do they correspond to suceessive stages in the progress of a lesson ?

পাঠ পরিচালনায় প্রশ্নের স্থান—

Ans. সেনাপতির কাছে সমরক্ষেত্রের নক্সার মতই শিক্ষকের কাছে পাঠটীকার মূল্য। উপমাটা আরো একটু ঠেলে নিয়ে যাওয়া যাক। যুদ্ধের নক্সার সঙ্গে যদি পাঠটীকার তুলনা করতে হয়। তাহলে সুসজ্জিত সৈন্য সামন্তের সঙ্গে তুলনা করা চলে প্রশ্নাবলীর। সৈন্যেরা যেমন সুকৌশলে পরিকল্পনা অনুযায়ী ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে যুদ্ধ জয় করে, পাঠ ও পরিকল্পনা অনুসারে এগিয়ে যায় প্রশ্নের সাহায্যে। সৈন্যের রণচাতুর্য ও বীরত্বের উপরে যেমন যুদ্ধের জয় পরাজয় নির্ভর করে, তেমনি ভালমন্দ প্রশ্ন নির্বাচনের উপরেই পাঠের সফলতা বিফলতা নির্ভর করে।

সুতরাং পাঠটীকা আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন নির্বাচন ও প্রশ্ন করবার কৌশল আলোচনা করা দরকার। কারণ ভাল প্রশ্ন করতে না জানলে কখনও ভাল শিক্ষক হওয়া যায় না—(a bad questioner is a bad teacher—David Salmon).

প্রশ্ন করি কেন—

প্রথমেই দেখা দরকার প্রশ্ন করি কেন অর্থাৎ পাঠ পরিচালনায় প্রশ্নের স্থান কোথায় ? আমরা সাধারণতঃ প্রশ্ন ক'রে পড়া ধরি—পাঠ্যবস্তু কতখানি আয়ত্ব হয়েছে তাই পরীক্ষা করবার জন্যে—কিন্তু প্রশ্নের উদ্দেশ্য তা মোটেই হওয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন করবার প্রয়োজনীয়তাকে আমরা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ক'রে দেখতে পারি। যথা—

[১] ছাত্র কতটা শিখেছে তা তার নিজেরই বুঝবার জন্য।
[২] ছাত্র কতটা শিখেছে তা অপরকে দেখাবার জন্য।
[৩] ছাত্র শিক্ষককে কতটা অনুসরণ করতে পেরেছে তা বুঝবার জন্য।
[৪] ছাত্রের চিন্তাশক্তিকে আরো উদ্বোধিত করার জন্য।
[৫] ইতিপূর্বে যা শেখা হয়েছে তার পুনরাবৃত্তির জন্য।
[৬] যতখানি পাঠদান করা হ'ল তার কতটা কাজে লাগল তা বুঝবার জন্য।

[৭] ছাত্রের মনে নূতন পাঠের প্রতি আগ্রহ জাগাবার জন্য।
[৮] ছাত্রের অমনোযোগ প্রতিরোধের জন্য।
এবং [৯] ছাত্রের আত্মপ্রবঞ্চনা প্রতিরোধের জন্য।

এই কারণগুলিকে আর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবার দরকার আছে বলে মনে হয় না। ছাত্রের মনের অন্ধকারময় গোপন মণিকোঠার সন্ধান ত শিক্ষককে এই প্রশ্নের বাতি জেলেই নিতে হবে। অবশ্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যের জন্য প্রশ্নও হবে বিভিন্ন ধরণের সুতরাং প্রয়োজনানুরূপ প্রশ্ন তৈরী করা একটা মস্তবড় জটিল সমস্যা ও সুনিপুণ শিল্পকার্য। প্রত্যেক শিল্পকার্যেরই যেমন একটা নিয়ম শৃঙ্খলা গড়ে উঠে, প্রশ্নগঠন কার্যেরও তেমনি গড়ে উঠেছে একটা বিধিনিয়ম। বহু শিক্ষাবিদ ও মনস্তত্ত্ববিদের সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ ক'রেই এইসব বিধিনিয়ম-শৃঙ্খলাগুলো রচিত হয়েছে। সুতরাং অনভিজ্ঞ নূতন শিক্ষার্থী-শিক্ষকের পক্ষে প্রশ্ন নির্মাণের এই নিয়মশৃঙ্খলার মূল সূত্রগুলি জানা একান্ত আবশ্যক।

পাঠটীকা যেমন তিনখণ্ডে বিভক্ত, প্রত্যেক খণ্ডের প্রশ্নও হবে তেমনি তিনটি বিভিন্ন জাতের। ১ম—আগ্রহ উদ্দীপক প্রশ্ন (Thought provoking questions) ২য়—পাঠ পরিণতিমূলক প্রশ্ন। (Developing questions), ৩য়—পরীক্ষামূলক প্রশ্ন (Testing questions),

প্রশ্নের ভাষা সম্পর্কে—

(১) প্রশ্নের ভাষা সহজ সরল ও সুনির্বাচিত শব্দের দ্বারা গঠিত হওয়া চাই—বাক্য যত ছোট হয় ততই ভাল। একটা দৃষ্টান্ত নিই—"তোমাদের মধ্যে কোন ছেলে যদি এই গ্রীষ্মের ছুটির শেষের দিকে এখান থেকে বহুদূরে এমন এক পল্লীগ্রামে যাও সেখানে সবুজ মাঠের ধারে ধারে কাদা আর তার নীচেই ঘোলা জলের ডোবা, আর সেখানে গিয়ে যদি তোমরা খেয়াল খুশি মত ইট পাটকেল ছুঁড়তে থাক তাহলে একজাতীয় ছোট ছোট জীবকে লাফিয়ে লাফিয়ে জলে পড়তে দেখবে। বলত সেই জীবগুলি কি?"—ব্যাঙের কথা বলতে গিয়ে এই জাতায় প্রশ্ন করলেই হয়েছে আর কি।

অথবা "প্রাবৃটকালে মার্তণ্ডের প্রচণ্ডতা থাকে না কেন?" বাক্য ছোট হ'লে কি হয়, শব্দের হুঙ্কারের ছাত্রের দফা শেষ হবে। বলাই বাহুল্য এ জাতীয় প্রশ্ন একেবারেই অচল।

(২) প্রশ্নের ভাষা যতদূর সম্ভব পাঠ্য পুস্তকের ভাষাকে অনুসরণ না ক'রে

চলাই উচিত। বইয়ের ভাষায় প্রশ্ন করলে উত্তর সাধারণতঃ বইয়ের ভাষাতেই দেবে ছেলেরা—তাতে তাদের চিন্তাশক্তির কোন পরিচয় পাওয়া যাবে না। হুবহু বইয়ের কথা দিয়ে কখনও প্রশ্ন করতে নেই—যথা "ইংলণ্ডে চা উৎপন্ন হয় না"—কেন হয় না ?—"তুন্দ্রাবাসী এস্কিমোরা যাযাবর"—কারা যাযাবর ?—এ জাতীয় প্রশ্নে শিক্ষকেরও চিন্তাশীলতার কোন প্রমাণ নেই।

(৩) প্রশ্নের সময় ঠিক প্রশ্ন ছাড়া অযথা বাক্য-বিন্যাস করা উচিত নয়—" "আচ্ছা দেখি ত তোমাদের মধ্যে কে বলতে পারে—" অথবা "এই কথাটির জবাব যে দিতে পারবে, বুঝব সে ভাল পড়া করেছে"—এই জাতীয় প্রশ্নের ভূমিকায় ছাত্রের মনে বিরক্তি উৎপাদন করে।

(৪) প্রশ্ন হবে সুস্পষ্ট এবং একটি মাত্র নির্দিষ্ট উত্তরের প্রতি কেন্দ্রীভূত।—"পলাশীর যুদ্ধের পর কি ঘটেছিল ?" অথবা "নদীর জলে কি ভাসে ?" এই জাতীয় অনির্দিষ্ট অস্পষ্ট প্রশ্নের একাধিক উত্তর হ'তে পারে। ছাত্র বুঝতে পারে না শিক্ষক ঠিক কোন জিনিষটি চান।

(৫) বিকল্প উত্তর হ'তে পারে এমন প্রশ্ন ভাল নয়—"বাদুড়ের ডিম হয় না বাচ্চা হয় ? পদ্মফুল দিনে ফোটে না রাত্রে ফোটে ?" এই জাতীয় প্রশ্নে দুটো মাত্র উত্তর হতে পারে—তার মধ্যে একটি ভুল অপরটি ঠিক। এ ক্ষেত্রে ছাত্রেরা অনেক সময়ে আন্দাজে উত্তর দিয়ে বাহাদুরী নেয়।

(৬) এমন কোন প্রশ্ন করা ঠিক নয়—যার উত্তর শুধুমাত্র হাঁ বা না দিয়েই দেওয়া যায়।

"তোমরা কেউ বাঘ দেখেছ ? নদী কোথা হতে উৎপন্ন হয় বলতে পার ? তুমি কি ফুটবল খেলতে ভালবাস ?"—এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তরে ছেলের একটুও চিন্তাশক্তি উদ্বোধিত হয় না। আন্দাজে একটা হাঁ বা না ব'লে দিলেই হ'ল।

(৭) এমন প্রশ্ন করা ঠিক নয় যার উত্তর হবে সুদীর্ঘ অর্থাৎ অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা বলতে হবে। যথা—আকবরের শাসন প্রণালী বর্ণনা কর" কিংবা আফ্রিকার জলবায়ুর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও"—এই বিষয়গুলিকে আরো ৫।৬টি এমন ছোট ছোট প্রশ্নে ভেঙ্গে দেওয়া যেতে পারে যার উত্তর ২।১টি কথায় দেওয়া যায়।

(৮) পড়াবার সময় যে কথাগুলি বলা হ'ল, পর মুহূর্তে সেই কথা ধরেই প্রশ্ন করা চলবে না। যেমন বলা হল "শেরসাহ প্রথম এদেশে ঘোড়ার ডাকের প্রবর্ত্তন করেছিলেন। অমনি প্রশ্ন—কে ঘোড়ার ডাক প্রবর্তন করেছিলেন ?

ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন—ইংলণ্ডের রাজধানীর নাম কী ?" বলাই বাহুল্য এই জাতীয় প্রশ্নের কোন সার্থকতা নেই।

(৯) শূন্যস্থান পূরণের প্রশ্ন করা চলবে না, যেমন—আমেরিকা আবিষ্কারকের নাম হচ্ছে ? উত্তর হ'ল—কলম্বস।

মাদ্রাজিদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে—? উত্তর হল—ভাত।

এ ধরণের প্রশ্নে ছাত্রের চিন্তাশক্তি উদ্বোধিত হয় না—যেটুকু জানে সেটুকুও গুছিয়ে বলবার ক্ষমতা হয় না।

(১০) প্রশ্ন সব সময়েই পাঠ্যের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক হওয়া চাই, নইলে ছাত্রের চিন্তাশক্তি বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। বর্ষার কবিতা পড়ান হবে, আয়োজনে বর্ষা ঋতু সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হল—তা থেকে অন্যান্য ঋতুর কথা—তা থেকে বিভিন্ন ঋতুতে প্রাকৃতিক বর্ণনা—এইভাবে অযথা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ান্তরে চলে গেলে পাঠ কেন্দ্রচ্যুত হয়ে পড়ে।

(১১) প্রশ্নের মধ্যে কিছু কিছু ভাষার বৈচিত্র্য আনা দরকার। অনেক সময় একটা প্রশ্নই ২।৩ বার করার দরকার হতে পারে—সে ক্ষেত্রে একই ভাষা ব্যবহার না ক'রে বিভিন্নভাবে করার চেষ্টা করা উচিত। যেমন পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভ সিরাজদ্দৌল্লাকে পরাজিত করেন—প্রশ্ন করা যায়—(i) ক্লাইভ সিরাজকে কোন যুদ্ধে পরাজিত করেন ? (ii) ক্লাইভ পলাশীর যুদ্ধে কাকে পরাজিত করেন ? (iii) সিরাজকে কে পরাজিত করেন ? (iv) কার হাতে সিরাজের পরাজয় ঘটল ? এইভাবে একই প্রশ্ন নানাভাবে ঘুরিয়ে করা যায়। তাতে প্রশ্নের একঘেয়েমি নষ্ট হয়।

(১২) কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পর একই ভাষায় ঐ প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করা ঠিক নয়—তাহ'লে ছেলেরা শিক্ষকের প্রশ্নের প্রতি সব সময়ে সমান মনোযোগ দেবে না—কারণ তারা জানে যে শিক্ষক ওটি ২।৩ বার বলবেন।

(১৩) এমন প্রশ্ন করা ঠিক নয় যার উত্তরটা প্রশ্নের মধ্যেই থেকে গিয়েছে যথা—চিত্তরঞ্জন ছিলেন প্রকৃত দেশের বন্ধু সেইজন্য দেশবাসী তাঁকে কি নাম দিয়েছিল ?—এ জাতীয় প্রশ্ন কোন চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করে না।

(১৪) প্রশ্ন সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে—শিক্ষক প্রশ্নগুলি এমন মধুরভাবে অন্তরঙ্গতার সঙ্গে করবেন যে ছাত্রদের উত্তর দেবার একটা স্বাভাবিক আগ্রহ জাগবে। আদালতে জেরা করার মত যেন একটা ভয়াবহ ব্যাপার পরিণত না হয় ক্লাশে।

এইবার প্রশ্নগুলি কিভাবে করা হবে সেই সম্বন্ধে ২।১টি কথা বলেই বক্তব্য শেষ করি—

(১) প্রশ্ন কখনই কোন ছাত্র বিশেষকে উল্লেখ ক'রে করা হবে না—প্রশ্ন করা হবে সমস্ত ক্লাশকে—সম্ভাব্য উত্তর সম্বন্ধে সকলেই ভাববে। তারপর যারা পারবে তাদের হাত তুলতে ব'লে তার মধ্যে থেকে জিজ্ঞাসা করবেন।

(২) প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করবেন না—ভাববার জন্য একটু সময় দিতে হবে।

(৩) প্রশ্ন সব সময়ে হাত-তোলা ছেলেদের মধ্যেই আবদ্ধ রাখবেন না, হাত-না-তোলার মধ্যেও মাঝে মাঝে প্রশ্ন করবেন।

(৪) প্রশ্ন কখনও পর পর ছেলেদের ধরে যাবেন না—সামে পিছনে আশে পাশে অর্থাৎ সারা ক্লাশে প্রশ্ন ছিটিয়ে দেবেন।

(৫) ক্লাশে পাঠ পরিচালনার সময় চেয়ারে বসে বা টেবিলে ঝুঁকে থাকবেন না—এক জায়গায় কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়েও নয়, আবার সারা ঘর পায়চারি করেও বেড়াবেন না। মোটকথা বেশ সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে চলাফেরা করবেন। অনেকে পড়াতে পড়াতে বেঞ্চের পাশ দিয়ে ক্লাশের শেষ পর্যন্ত চলে যান। এটা কখনও উচিত নয়। ভেবে দেখবেন সমস্ত ছেলের দৃষ্টি আপনার দিকে—আপনি যদি ক্লাশের পিছনে চলে যান তাহলে সব ছেলের চোখ ঘুরে যাবে পিছন দিকে...ক্লাশের মনোযোগ ব্যাহত হবে।

৬। অনেকে ক্লাশের দিকে পিছন ফিরে অনেকক্ষণ ধরে বোর্ডে লিখে যাচ্ছেন— এটা ভাল নয়। প্রথমতঃ বোর্ডটা এমনভাবে বসাতে হবে—যাতে লিখবার সময় শিক্ষককে একেবারে পিছন ফিরতে না হয়। তাছাড়া অনেকক্ষণ ধরে কিছু লেখা ভাল নয়। অল্প অল্প ক'রে লিখতে হয়।

(৭) একসঙ্গে একাধিক ছেলের উত্তর দেওয়া চলবে না—শিক্ষক সে বিষয়ে নির্দেশ দেবেন।

(৮) ক্লাশে গিয়ে হয়ত দেখা যাবে বোর্ডে আগের ঘণ্টার পাঠ্য বিষয় লেখা রয়েছে—পড়ান হচ্ছে বাংলা কবিতা, শিক্ষক নানাভাবে পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করছেন,—অথচ ছাত্রদের সম্মুখেই বোর্ডভরা এলজ্যাবরার অঙ্ক কষা। এটা খুব খারাপ। শিক্ষক ক্লাশে গিয়েই বোর্ড মুছে নেবেন এবং ক্লাশের শেষে বোর্ড মুছে দিয়ে আসবেন।

(৯) আগের দিন যদি কোন গৃহকাজ দেওয়া থাকে সেটি অবশ্য দেখতে ভুলবেন না—তা না হ'লে গৃহকাজের কোন গুরুত্ব থাকবে না। খাতা

ক্লাশে দেখবেন না, অবসর সময়ে দেখে এনে মনিটার মারফত ফিরিয়ে দেবেন।

(১০) ছাত্রেরা কোন ভুল উত্তর দিলে অপর ছাত্রের দ্বারা তার সংশোধনের চেষ্টা করবেন, কেউ না পারলে শিক্ষক বলে দেবেন। অসংশোধিত ভুল উত্তর ফেলে রেখে কখনই দ্বিতীয় প্রশ্নে যাবেন না।

(১২) ভুল উত্তর যেমন না জানার জন্য হতে পারে আবার তেমনি— প্রশ্নটি ঠিকমত বুঝতে না পারার দরুণও হতে পারে। সুতরাং ভুলের কারণটি নির্ণয় ক'রে তবেই তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(১২) কোন ছাত্র কোন ভুল বা হাস্যকর উত্তর দিলে শিক্ষক কখনই হাসবেন না বা ক্লাশে এই নিয়ে হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করবেন না। এই জাতীয় উত্তরের কারণটি অতি সহানুভূতির সঙ্গে নির্ণয় করবার চেষ্টা করবেন।

এখানে আরো একটা বিষয় লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রশ্নগুলি কেবলমাত্র পাঠ্যবিষয়টির দিকে লক্ষ্য রেখে করলেই চলবেনা পাঠকের দিকেও সমভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। অর্থাৎ প্রশ্ন ছাত্রের বুদ্ধি বিবেচনা ও মানসিক সামর্থ্যের দিকে লক্ষ্য না রেখে করলে সমস্ত পাঠই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

অনেক সময় দেখা যায় একই কবিতা উচ্চশ্রেণীতেও পড়ান হচ্ছে, আবার নিম্নশ্রেণীর পাঠ্যসূচীতেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই দুই শ্রেণীতে পাঠ পরিচালনা নিশ্চয়ই একই ভাবে হবে না। ঐ কবিতাটির পাঠটীকা শ্রেণীকক্ষের বুদ্ধি-সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের হবে, এ কথা ত বলাই বাহুল্য

এইখানে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বক্তব্যবিষয়টি পরিষ্কার করবার চেষ্টা করা যাক।

রবীন্দ্রনাথের "দেবতা-বিদায়" শীর্ষক বিখ্যাত কবিতাটি ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য নির্দ্ধারিত সংকলিতা ১ম ভাগে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, আবার ঐ কবিতাটি নবম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকেও দেখা যায়। কবিতাটির শেষ চারিটি ছত্র দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করি—

ভক্ত বলে 'প্রভুমোরে কী ছল ছলিলে!'
দেবতা কহিল, 'মোরে দূর করি দিলে।—
জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া তরে।
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।'

ষষ্ঠ শ্রেণীতে সোজাসুজি কাহিনী মূলক প্রশ্ন করা যেতে পারে যথা :—

(১) ভক্ত কি কহিলেন?
(২) দেবতা উত্তরে কি বলিলেন?

(৩) ভক্ত দেবতাকে 'কা ছল ছলিলে' বলিলে কেন ?
(৪) দেবতা জগতে কি ভাবে বেড়ান ?
(৫) কি জন্য তিনি বেড়ান ?
(৬) কি করিলে তিনি ঘরে থাকেন ?
(৭) গৃহহীনকে কি দিতে হয় ? ইত্যাদি

উচ্চতর শ্রেণীতে কবিতাটির তাৎপর্য মূলক প্রশ্ন করিলে ভাল হয়। যথা—

(১) ভক্ত এখানে দেবতার কোন ছলনার কথা উল্লেখ করিতেছেন ?
(২) ভিখারী অকস্মাৎ দেবতার মুর্তি ধরিল বলার তাৎপর্য কী ?
(৩) "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর" বিবেকানন্দের এই কবিতাটির মর্মার্থ এই কবিতায় কি ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে ?

(৪) ভগবান জগতে দরিদ্ররূপে কি ভিক্ষা করিয়া বেড়ান ?
(৫) ভগবান মানুষের হৃদয়ে দয়া চান—বলিবার উদ্দেশ্য কি ?
(৬) গৃহহীনকে গৃহ দিলে তবেই ভগবান গৃহে থাকেন এই জাতীয় একটি তুলনীয় কবিতা বল—

[তুলনীয়—অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি......... তবে আজ কিসের উৎসব ? কাঙ্গালিনী রবীন্দ্রনাথ) ?

(৭) কোন সবল ভাই যদি অপর দুর্বল ভাইকে অযথা উৎপীড়ন করে তবে পিতা সেই উৎপীড়ক পুত্রকে কি ভাবে দেখেন ?

(৮) ভগবানকে যদি জগৎ পিতা বলা যায় তাহা হইলে মানুষে মানুষে কি সম্বন্ধ হয় ?

(৯) মানুষ যদি মানুষকে কষ্ট দিয়া ভগবানকে পূজা করিতে বসে তাহা হইলে ভগবান কি বলিবেন—

[তুলনীয়—তোরা ছেলের মুখে থুথু দিয়ে মার মুখে দিস ধূপের ধোঁয়া ?]
নজরুল—

(১০) "দেবতা বিদায়" এই শিরোনামের অর্থ কি ?

(১১) প্রবীন ভক্ত নিশিদিন দেবতার নাম জপ করা সত্বেও মন্দির হইতে দেবতা বিদায় লইতেছেন কেন ?

(১২) দেবতার নাম জপ না করিয়াও কি করিলে দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করা যায় ?

(১৩) প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ কি ?

Q. 3. What is illustration ? Enumerate its different kinds with special reference to their uses in different subjects and at various stages of teaching.

Ans. ১৯৫১ সালের Paper IV ৫নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

Q. 4. Examine critically the present system of public Examination and comment on some of the improvements suggested in recent years.

Ans. শিক্ষার ক্রমবিকাশ পরীক্ষার দ্বারা সূচিত হয়। শিক্ষার আরম্ভ
হ'তে পরিণতির মধ্যে প্রত্যেকটি পরীক্ষা মাইল ষ্টোনের (mile stone.)
কাজ করে। আমরা কেমন করে লক্ষ্যের পথে চলেছি। পরীক্ষা তাহা
সঠিক বলে দেবে। শিক্ষা-লক্ষ্যের এই যাত্রাপথে পরীক্ষা আমাদের গতি
নির্ণয় করে। সুতরাং লক্ষ্যমত আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যেমন সর্বাঙ্গ সুন্দর
হওয়া চাই, তেমনি সুষ্ঠু ও সঙ্গত হওয়া চাই আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতি।
কোনটির মধ্যেই ত্রুটি বা ফাঁক থাকলে চলবে না। এ কথা সত্য, "To the
pupil the examination gives a goal towards which he shall
strive and stimulus urging him to attain that goal in a given
time, thereby demanding steady and constant effort. This
makes the purpose clear and the method of apporach
defenite,......and finally it gives him a hallmark recognised
by all.

কথাটি যেমন প্রযোজ্য শিক্ষার্থীর পক্ষে শিক্ষকের পক্ষে ও ইহার তেমনি
প্রয়োজন রয়েছে। নানাভাবে শিক্ষার্থীকে বিচার করবার সুযোগ রয়েছে
ইহার মধ্যে। "For the teachers, too, it is helpful to have a goal
and a stimulus."

আমাদের দেশে প্রচলিত বহিঃপরীক্ষা শিক্ষাধিকার, রাষ্ট্র বা অন্য কোন
বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন বোর্ড, সংস্থা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা পরিচালিত হয়।
এই পরীক্ষায় সাফল্যলাভের উপরেই শিক্ষক বা বিদ্যালয়ের সার্থকতা নির্ভর
করে। সুতরাং বিদ্যালয়ে এই বহিঃ পরীক্ষার (External or public
examination) প্রভাব অসীম। এই পরীক্ষাতে যে প্রশ্নগুলি ছাত্রের
কৃতিত্বের মান নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় তা রচনাধর্মী (Essay type) প্রশ্ন,

অর্থাৎ প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে গেলে কতগুলো ছোট বড় রচনা লিখতে হয়। এর ত্রুটি এই যে, যারা পরীক্ষক তাঁরা সেগুলি পরীক্ষা কোরে সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করলে তাঁদের সময় মাফিক মেজাজের (personal equation) উপর অনেকখানি নির্ভরশীল হয়। যদি কোন কারণে তাঁর মেজাজ ভাল থাকে তবে অল্পেই খুশী হয়ে হয়ত বেশী নম্বর দিয়ে দেবেন। আবার কোন ছাত্র হয়ত বেশী উত্তর দিয়েছে অথচ পরীক্ষকের মেজাজ তখন তত ভাল নেই, তিনি হয়ত ভাল উত্তরেই কম নম্বর দিয়ে দেবেন। তাছাড়া এক একজন পরীক্ষকের বিচারের মানও আলাদা। একজন পরীক্ষক হয়ত যে উত্তরে ৫০ নম্বর দিলেন, অন্য পরীক্ষক হয়তো সেই উত্তরেই ৪৫ নম্বর দিয়ে ফেলবেন। এমন কি যে পরীক্ষক যে উত্তরে আজ ৪০ নম্বর দিলেন সেই পরীক্ষকই হয়ত এক বছর বাদে সেই উত্তরেই ৬০ নম্বর দেবেন। কারণ প্রশ্নটি রচনাধর্মি, উত্তরটিও হয়েছে তেমনি ছোট বা অনতিদীর্ঘ রচনা। এমন রচনার মান নির্ণয় করার বেলায় যে পরীক্ষকের যেরূপ দৃষ্টিভঙ্গী তিনি সেইরূপই নির্ণয় করবেন।

ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ ডাক্তার মাইকেল ওয়েষ্ট পরীক্ষা ব্যাপারে গবেষণা করে উপরোক্ত পর্যায়ের ফলই পেয়েছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেছিলেন "Examinations are the webs of penelope, what the teachers do, the examiners undo."

শিক্ষাব্যবস্থার যেখানে মৌলিক ত্রুটি রয়েছে সেখানে পরীক্ষা পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ হবে ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। গতানুগতিক ধারায় পুরাতন পন্থাই অনুসৃত হচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে কৃত্রিম সেখানে পরীক্ষা রীতির উপর সুবিচার প্রত্যাশা করা দুরাশা মাত্র। তাই এখানে পরীক্ষা সহজে পাস করার জন্যেই সবকিছু করা হয়। সত্যকার শিক্ষিত হওয়ার কোন চেষ্টাই চলে না। এ ব্যবস্থায় শিক্ষার ফাঁক এবং পরীক্ষায় ফাঁকি। তাই আমাদের এই স্বল্প সংখ্যক শিক্ষিতের দেশেও বলতে শোনা যায় "অমুক বি, এ, পাস, অমুক এম, এ, পাস, কিন্তু একটা ইংরাজীতে দরখাস্ত লিখিতে দাও অথবা বাংলায় একটা পত্র লিখতে বল, পারবে না।" উত্তরে বলতে শুনি, "আরে রেখে দাও তোমার বি, এ, পাস, এম, এ, পাস; অমন আজকালে বিস্তর ছড়াছড়ি।" ইহা অত্যুক্তিও নয় হয়ত অযথা ও নয়। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, পরীক্ষা পদ্ধতির গলদ। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "কতগুলি পরের কথা ভাষান্তরে মুখস্ত করিয়া মাথার ভিতর পুরিয়া পাস করিয়া ভাবিতেছে আমরা শিক্ষিত। ছ্যাঃ ছ্যাঃ! ইহার নাম শিক্ষা!"

পরীক্ষকদের খেয়াল খুশীর কথা বাদেও বহিঃ পরীক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নকর্তার খেয়াল খুশীর উপরে সাফল্য অধিকতর নির্ভর করে। পাঠ্যক্রমের অন্তর্নিহিত নীতিগুলো অগ্রাহ্য করে প্রশ্নকর্তাগণ এমন সব উদ্ভট প্রশ্ন উপস্থাপন করে থাকেন যার সমাধান আমাদের এই কৃত্রিম শিক্ষা ব্যবস্থায় সম্ভবও নয়, সহজও নয়। তাই শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ে বহিঃ পরীক্ষার্থীর গড় প্রশ্নের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন, যাতে শিক্ষার্থীগণ অনায়াসেই পরীক্ষা-বৈতরণী পার হয়ে যেতে পারেন। প্রকৃত জ্ঞানার্জন কোরবার শিক্ষাথর্থীগণ কোন সুযোগই পায় না।

পরীক্ষা গ্রহণ শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বহু আলোচিত সমস্যা। বহুদিন ধরেই এর সংস্কার সাধনের জন্যে বিভিন্ন দেশে শিক্ষাবিজ্ঞানীগণ গবেষণা করছেন। আমাদের দেশে প্রচলিত বহিঃপরীক্ষা (Public Examination) পদ্ধতি বহুত্রুটি শিক্ষা সংক্রান্ত গণনা-কার্য (Educational Measurements) দ্বারা উদ্ঘাটিত হয়েছে। কিন্তু এই ধরণের প্রবন্ধ পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণের নানা দোষত্রুটি, থাকলেও শিক্ষাবিদগণ কেউ একে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করেননি। এবং যুক্তিনিষ্ঠ প্রকাশের গুরুত্বের দিক থেকে অনেকে এর অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞান বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কারও পরীক্ষায় ছাত্রদের কৃতিত্বের মানের সংখ্যা নির্দেশের (Scoring) পরিবর্তন আশা করে।

এই রীতির ত্রুটিগুলোর সংস্কার সাধনের জন্যে শিক্ষাবিজ্ঞানীগণ ইহার অনুপূরকস্বরূপ এক নূতন বস্তুতান্ত্রিক পরীক্ষার (objective test) উদ্ভাবন করেছেন। এই পরীক্ষারীতি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, এই পদ্ধতিতে পরীক্ষা কেবলমাত্র বিজ্ঞানধর্মী বা গণিতধর্মী-বিষয়েই সুবিধাজনক। কিন্তু যে সব বিষয়ের পরীক্ষাতে পরীক্ষার্থীর রচনাশক্তির বা চিন্তা, যুক্তিও বিশ্লেষণ প্রভৃতির প্রয়োগ করতে হয় সে ক্ষেত্রে বিশেষ সুফলদায়ক হয় না। সুতরাং উল্লিখিত উভয়প্রকার রীতির সংমিশ্রণে প্রশ্নপত্র তৈরী হলে অনেকাংশে পরীক্ষা-রীতির সংস্কার সাধন করা হবে, এবং পরীক্ষার্থীর কৃতিত্বের মানও নির্ণয় করা সহজ হবে।

Q. 5. Explain what is meant by self-Government in schools ? What measures would you adopt to introduce and popularise it in your school ?

Ans. ১৯৫১ সালের Paper IV ৪ (c) নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

Q. 6. Indicate the physical mental and moral values of organised govres.

Ans. ১৯৫২ সালের Paper IV ১০নং প্রশ্ন (বহির্বিদ্যালয়ের খেলাধূলার) অংশ দ্রষ্টব্য।

Q. 7. What is the necessity of the School time-table? How does it reflect the organisation and general aims of the School?

Ans. ১৯৫০ সালের ৯নং প্রশ্ন অথবা ১৯৫৬ সালের Paper IV ৬নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

Q. 8. Discuss the advantages and limitations of the project method and illustrate your answer with concrete. example.

Ans. ১৯৫৫ সালের Paper I ৬ (b) প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

Paper IV—1962

Q. 1. In what defferent ways car Schools safeguard the health of its Scholars ?

Ans. হাইজীন অংশ দ্রষ্টব্য।

Or, Discuss some of the unhealty habits generally noticed in School pupils. How do you propose to eradicate them ?

Ans. হাইজীন অংশ দ্রষ্টব্য।

Q. 2. A child learns by his own activity Elucidate the statement with reference to Activity Method in Education.

Ans. ১৯৫০ সালের Paper III ৭নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

Q. 3. Dicipline should be maintained at any Cost. How far is the statement true ? Discuss the function of punishment in the sphere of mainentance of discipline.

Ans. ১৯৫২ সালের Paper I ৫নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

Q. 4. What is Daltan Plan ? Discuss its advantages and limitations and illustrate your answer with suitable examples.

Ans. ১৯৫২ সালের Paper IV ৬নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

Q. 5. Give practical advice to an untrained teacher who has just entered upon his teaching career on (a) preperation of lesson, (b) use of the black-board and (c) treatment of backward children.

শিক্ষা কার্যে ব্রত নূতন শিক্ষককে নিম্নবিষয়ে নির্দেশ দিবার –

Ans. সৃষ্টিধর্মী কাজ মাত্রেরই একটা উদ্দেশ্য থাকে আমরা যখন পাঠদান করতে যাব তখন মনের মধ্যে একটা সু

থাকবে। এবং সেই উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই আমাদের পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

'উদ্দেশ্য' কথাটিকে বিশ্লেষণ করা দরকার। সব পাঠদানের উদ্দেশ্যই ত বিদ্যাদান কিন্তু সূক্ষ্মভাবে ভেবে দেখলে তার মধ্যে তারতম্য আছে। বিষয়-ভেদে এবং শ্রেণীভেদে এই উদ্দেশ্যের ইতর-বিশেষ ঘটবে না কি? সকল পঠিতব্য বিষয়গুলিকেই আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি—জ্ঞানমূলক ও অনুভূতিমূলক। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়গুলি জ্ঞানমূলক—তত্ত্ব ও তথ্য হ'ল এর মূলকথা। কিন্তু সাহিত্য? সেখানে ত রসানুভূতি-টাই চরম কথা। সুতরাং সাহিত্যের পাঠদানের প্রসঙ্গে যদি আমরা রসানুভূতিরই প্রাধান্য দিই তাহলে এমনভাবে পাঠ পরিচালনা করতে হবে যাতে ব্যাকরণের কচকচি এসে রস-সৃষ্টির ব্যাঘাত না ঘটায়। ব্যাকরণ শেখানোর জন্য স্বতন্ত্র পাঠ দেব কিন্তু কাব্য পাঠের রসাভাব ঘটাতে অবশ্যই দেব না।

এইভাবে শ্রেণীতে পাঠদানের উদ্দেশ্যটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে প্রথমেই।

এর পর হচ্ছে পাঠদানের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ—আয়োজন। এই অংশের ব্যাখ্যা করতে গেলে শিশুমনস্তত্ত্বে হার্বাটীয় দৃষ্টীভঙ্গী সম্বন্ধে সংক্ষেপে ২।১টা কথা বলা দরকার, কারণ হার্বাটীয় দর্শনের উপর ভিত্তি করেই বর্তমানের ত্রি-সোপানিক (পঞ্চ সোপানের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ) পাঠটীকার উদ্ভব ঘটেছে।

হার্বার্ট বলেন, আমাদের যখন কোন অভিজ্ঞতা ঘটে তখন তার একটা অস্পষ্ট ছাপ আমাদের মনের মধ্যে থেকে যায়। হার্বার্ট এই অস্পষ্ট ছাপের নাম দিয়েছেন এন্‌গ্রাম্ (Engram)। শুধু তাই নয়, নানা প্রকারের এন্-গ্রামগুলি পরস্পর জোড়া তাড়া লেগে নতুন নতুন ছবি আমাদের মনের মধ্যে ফুটিয়ে তুলছে এবং এই নতুন ছবিগুলির নাম দিয়েছেন তিনি "এপারসেপটিভ্ মাস্" (Apperceptive Mass) অথবা "এন্‌গ্রাম কমপ্লেক্স্" Engram Complex)। বাংলায় এদের বলা হয় ভাবজট বা ছাপজট।

শিশুমনের এই 'ভাবজট-বৃত্তির' সহায়তায় শিশু পুরাতনের সঙ্গে নতুন অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করতে থাকবে—জানা থেকে অজানায় যাবে। অর্থাৎ শিশুকে নতুন অভিজ্ঞার সন্ধান দিতে হবে পুরাতন অভিজ্ঞতার সাহায্য নিয়ে। যা' ঘটে গিয়েছে অর্থাৎ শিশুর অভিজ্ঞতার মধ্যে যে সব বস্তুর ছাপ বা ভাবজট

আছে তারি মাধ্যমে, তারি সহায়তায় নতুন বস্তুর অবতারণা করতে হবে, তবেই শিশুমন তাকে গ্রহণ করবে, নচেৎ নয়।

সুতরাং নতুন কিছু বিষয় পাঠদান করতে গেলে প্রথমেই শিক্ষার্থীর মনের পুরাতন ভাবজাটের (Engram Complex) সন্ধান নিতে হবে। কিন্তু কি করে তা করা যায়?

নানাবিধ প্রশ্ন করে, নানাপ্রকার কথাবার্তা বা আলাপ আলোচনার সাহায্যে ছাত্রের মনের সেই ভাবজটটি জাগ্রত করতে হবে, পূর্ব অভিজ্ঞতার পরিধিটি জানতে হবে, আবিষ্কার করতে হবে পঠনীয় বিষয়ের কোন অংশটুকু অথবা পাঠ্যের সঙ্গে কোন প্রকার সম্বন্ধযুক্ত কোন্ বিষয়টুকু ছাত্রের পরিচিত।

মোটকথা—শিক্ষক ও ছাত্রের চিন্তাধারার একটা সাধারণ অংশ নানাবিধ প্রশ্নের মাধ্যমে আবিষ্কার ক'রে নিতে হবে সর্বাগ্রে। তারপরে তাকেই ভিত্তি ক'রে চলবে নতুন পাঠদান প্রক্রিয়া।

ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য, গণিত—কত বিষয় ছাত্রেরা পড়ে। প্রত্যেকটি বিষয়ের আনুষঙ্গিক ভাবজট জাগ্রত করবার বা সাধারণ অংশ আবিষ্কার করবার কৌশলটির মধ্যে সার্থক শিক্ষকের কৃতিত্ব নিহিত। তাছাড়া কোন নতুন বিষয় পড়ান আরম্ভ করবার পূর্বে ছাত্রের মনে যদি সে বিষয়ে কৌতূহল জাগান না যায় তাহলে কোন শ্রমই কাজে লাগে না। লোহা না তাতালে কি তাতে নতুন ছাপ নেয়? অক্ষুধার উপর খেলে যেমন কোন বস্তুই গায়ে লাগে না, আগ্রহ না জাগিয়ে শেখালেও তেমনি তা মনে লাগে না। তাছাড়া বর্তমান পাঠদান পদ্ধতিতে ৪৫ মিঃ অন্তর যে ভাবে বিষয়ের পরিবর্তন ঘটে, তাতে নতুন-পড়া আরম্ভ করার পূর্বে এইভাবে প্রাথমিক প্রস্তুতিকরণ ত অত্যাবশ্যক।

এই প্রসঙ্গে আর একটি জিনিষ লক্ষ্য রাখতে হবে যে' প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ফলে ছাত্রের মনে যেন 'পরীক্ষা দিচ্চি' এমন মনোভাবের সৃষ্টি না হয়—তাহলে শিক্ষক ও ছাত্রের মনের স্বচ্ছন্দ আদান-প্রদানের গতিটা একেবারে রুদ্ধ হয়ে যাবে,—অথচ এইটেই হ'ল পাঠদানের প্রাণবস্তু।

একটা জিনিষ লক্ষ্য করবেন—ছাত্রেরা কিন্তু এতক্ষণ পর্যন্ত জানে না শিক্ষক আজ তাকে কোন দিকে নিয়ে চলেছেন। শিক্ষক নানাবিধ কৌতুককর প্রশ্ন ক'রে ধীরে ধীরে ছাত্রের মনকে অজ্ঞাতসার পাঠ্যাভিমুখে নিয়ে চলেছেন—অতি কৌশলে, অতি সন্তর্পণে।

আগেই বলেছি পাঠ দুই জাতের—জ্ঞানমুখী আর ভাবমুখী। সুতরাং

তাদের উপস্থাপনাও হবে দুই প্রণালীর। জ্ঞানমুখী পাঠের পাঠটীকায় উপস্থাপনা অংশ দু'টি ভাগে বিভক্ত—বিষয় ও পদ্ধতি। অর্থাৎ একভাগে বলা হবে কি বিষয় পড়াব এবং অপর ভাগে বলা হবে কি পদ্ধতিতে পড়াব। বিষয়বস্তু ছাত্রের সম্মুখে উপস্থাপিত করার সময় সমগ্র পাঠ্য বিষয়টিকে এমন কয়েকটি খণ্ডে ভাগ ক'রে নিতে হবে যে ভাবের দিক থেকে সেগুলি যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় এবং বিভিন্ন খণ্ডগুলির মধ্যে যেন একটা সম্বন্ধ থাকে। তারপর সেই বিষয়গুলির পাশে পাশে এমন কতকগুলি প্রশ্নগুচ্ছ রচনা করতে হবে যে, তার উত্তর দেবার প্রসঙ্গেই পাঠ্য বিষয়টি ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবে। প্রশ্নের উত্তর কতটুকু ছাত্র বলবে আর কতটুকু শিক্ষক ব'লে দেবেন সেটা নির্ভর করবে ছাত্রের জ্ঞানের পরিধির উপরে এবং শিক্ষকের প্রশ্ন রচনার কৌশলের উপরে।

ভাবমুখী বিষয় অর্থাৎ সাহিত্যাদি পাঠের সময় আর উপস্থাপনা অংশ বিভক্ত করার দরকার নেই। প্রাধান্য সেখানে বিষয়বস্তুর নয়, রসবস্তুর। তাই সেখানে আদর্শ পাঠের মূল্য অনেক বেশী। অর্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ছন্দ যতি তাল সহযোগে একটি ভাল কবিতার রস-সঞ্চারী পাঠ দেওয়া যায় তা'হলে ছাত্রের মনে যতখানি গভীরভাবে রেখাপাত করবে, কবির সঙ্গে কাব্যপাঠকের মনের যে সাহিত্য বা সহযোগ সৃষ্টি করবে তা কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেই হওয়া সম্ভব নয়।

এই অংশে যে প্রশ্ন নির্বাচন করতে হবে তাও কাব্যের মর্মোপলব্ধি, রস-গ্রহণ ও শিল্প-নৈপুণ্য সম্বন্ধীয় প্রশ্ন। প্রয়োজন-বোধে কাব্যিক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুরূপ ভাবসমৃদ্ধ কবিতাংশ উল্লেখ করাও চলতে পারে।

ভাষা ও সাহিত্য পঠন পাঠনার মধ্যেও এই দুই জাতের পাঠই আছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পাঠের কথাই ধরা যাক। ব্যাকরণ, অনুবাদ, প্রভৃতি বিষয়গুলিকে আমরা জ্ঞানমুখী পাঠের অন্তর্গত বলে ধরতে পারি আর সাহিত্য অর্থাৎ গদ্য পদ্য পাঠ সম্পূর্ণভাবেই ভাবমুখী। এর আবেদন মস্তিষ্কের বুদ্ধির কাছে নয়, হৃদয়ের অনুভূতির কাছে। জ্ঞানদান এর উদ্দেশ্য নয়, এর উদ্দেশ্য হল আনন্দদান সুতরাং এর পাঠদান-পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য হবে জ্ঞানার্জনে সাহায্য করা নয়, রসগ্রহণে সাহায্য করা, কবিচিত্তের সঙ্গে পাঠকচিত্তের সাহিত্য অর্থাৎ সহযোগ স্থাপন করা। পাঠটীকা প্রস্তুত করবার সময়ে এই মূল উদ্দেশ্যটি সব সময়ে মনের মধ্যে দৃঢ় ভাবে ধরে রাখতে হবে। পাঠদানের উদ্দেশ্য বলতে গিয়ে এই কথা ইতিপূর্বেই বলেছি।

এই উদ্দেশ্যই রূপায়িত হবে উপস্থাপন পর্যায়ে। কি ভাবে এই কার্যটি সার্থক ভাবে করা যায় সেইটি এইবার আলোচনা করব।

প্রথমেই প্রদেয় পাঠ্যাংশটুকুর একটি রসগ্রাহী আদর্শ পাঠ দেবেন শিক্ষক। এখানে একটা প্রশ্ন হয় শিক্ষক কতটুকু পড়বেন, অন্যকার পাঠ্যাংশটুকু, না পুরা রচনাটি? কেউ কেউ বলেন পুরা রচনা থেকে সামান্য একটু অংশ মাত্র পাঠ করলে রস নির্মিতি হবে কেমন করে? ছাত্রের মনে একটা অতৃপ্তিকর কৌতুহল থেকে যাবে, যার ফলে রসসৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটবে। কথাটা সত্য কিন্তু সুদীর্ঘ কবিতা, বিশেষতঃ দীর্ঘ গদ্য প্রবন্ধ একটানা পড়ে যাবার সময় কোথায়? তাতে শুধু পাঠই হবে, সম্যক পঠনের সুযোগ থাকবে না, এবং দীর্ঘতার দরুণ অনেক সময় পাঠ ক্লান্তিকরও হতে পারে। সুতরাং মধ্যপন্থা গ্রহণ করাই শ্রেয়। ছোট খাট কবিতা হলে প্রথম পাঠে সমগ্র কবিতাটি পড়ে দেওয়াই ভাল, যদিও সেটিকে ২।৩ দিনের পাঠের বিষয়ীভূত করা হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ কবিতা বা প্রবন্ধ হলে তাকে ভাবের দিক থেকে কয়েকটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ খণ্ডে ভাগ করে নিয়ে তার একটি খণ্ড পড়া যেতে পারে। যাই হোক সেটি সময় ও বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষক ঠিক করে নেবেন।

আদর্শ পাঠের পরে সেই পাঠ ছাত্রেরা ঠিক মত শুনেছে কিনা তা পরীক্ষা করবার জন্য এইবার শিক্ষক ২।৩টি স্থূল প্রশ্ন করবেন। এই প্রশ্ন কিন্তু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণাত্মক হবে না, পঠিত ঘটনামাত্র অবলম্বনে এই প্রশ্ন রচিত হবে—এই জাতীয় প্রশ্নে অমনোযোগী ছাত্রকে মনোযোগী হতে সাহায্য করবে। এরপর হবে কাব্যের বা প্রবন্ধের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। তার জন্য শিক্ষক প্রদেয় পঠ্যাংশটুকুকে আরো কয়েকটি ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি খণ্ডের পূর্বরূপ আদর্শ পাঠ দেবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণাত্মক প্রশ্ন করবেন। এই সব প্রশ্নের মাধ্যমেই শিক্ষক পাঠের মর্মার্থ, ব্যাখ্যা, তাৎপর্য কঠিন শব্দার্থ প্রভৃতি উপস্থাপন করতে পারেন। (দৃষ্টান্ত হিসাবে শেষে কয়েকটি পাঠটীকার নমুনা দেওয়া হল) শব্দার্থ জিজ্ঞাসার প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে। অযথা শব্দার্থ ও ব্যাকরণ ঘটিত প্রশ্নের বাহুল্যে যেন কবিতার রসমাধুর্য নষ্ট না হয়ে যায়। তাছাড়া শব্দার্থের জন্য শব্দগুলিকে বাক্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে সতন্ত্রভাবে জিজ্ঞাসা করতে নেই! শব্দকে সব সময়ে বাক্যের পটভূমিতে রেখে তার অর্থ জিজ্ঞাসা করতে হয়। "তবে মিছে সহকার শাখা তবে মিছে মঙ্গল কলস—"পড়াতে গিয়ে সহকার শব্দের মানে কি—এই ভাবে প্রশ্ন করা অপেক্ষা 'মিছে সহকার শাখা'—বলতে কবি এখানে কি বুঝিয়েছেন?

—এই প্রশ্ন করা ভাল। শব্দ কখনই আমাদের সামনে বিচ্ছিন্ন ভাবে আসেন'—বাক্যের মাধ্যমেই আসে। কিন্তু অর্থবোধের সময় তাকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে না বুঝে মুখস্থ করাই (cramming) উৎসাহিত হয়।

এই ভাবে পাঠ্যাংশটির সমুদয় অর্থ তাৎপর্য এবং মর্ম সম্বন্ধে ছাত্রের ধারণা স্পষ্ট হলে পর তাদের পড়তে দিতে হয়।

বক্তব্য বিষয়ের সম্পূর্ণ চিত্রটি মনের মধ্যে যখন স্পষ্ট হয়ে উঠবে তখন সেই পাঠ হবে স্ব'ভাবিক, স্বতোৎসারিত। শিক্ষক ত ইতিমধ্যে আরো কয়েকবার পাঠ দিলেন। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে ভ আদর্শ পাঠ চলেছেই এবং ভাব গ্রহণের সঙ্গ সঙ্গে সেই আদর্শ পাঠের স্বরবৈচিত্র ও ছন্দযতির বিন্যাস ছাত্রের মনে স্থায়ী ভাবে মুদ্রিত হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এই স্তরেই ছাত্রের পাঠ যে সমধিক কার্যকরী সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

ছাত্রের পাঠের পরে এবং অভিযোজদের পূর্বে শিক্ষক পাঠ্যাংশটির আর একটি আদর্শ পাঠ দিলে ভাল হয়। গদ্য পাঠের বেলায় এটা হয়ত সম্ভব হবে না তবে কবিতা পাঠের বেলায় অবশ্যকরনীয়। এর কারণ আছে—

আগেই বলেছি, সাহিত্য পাঠের মুখ্য উদ্দেশ্য হল রসসৃষ্টি এবং ছাত্রদের সেই কাব্যামৃত রসাস্বাদ গ্রহণে সাহায্য করা। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যটি সম্পূর্ণরূপে সার্থক করিতে গিয়ে কাব্যের অর্থ ব্যাখ্যা তাৎপর্য নিয়ে এমন অনেক আলোচনা এতক্ষণ ধরে করতে হয়েছে যার ফলে কাব্যের সেই রসমূর্তি অনেকখানি অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে—রসাস্বাদন অনেকটা ব্যাহত হয়ে পড়েছে। সুতরাং কবিতাটির পুনরায় আদর্শ পাঠ দিয়ে শ্রেণী কক্ষে রসপরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

কবিই হলেন কাব্যের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা—কাব্যের মাধ্যমে কবি যেমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারবেন কোন টীকাকারই তা পারবেন না, তাই কাব্যের আদর্শ পাঠ এত প্রয়োজনীয়। প্রয়োজন বোধ করলে শিক্ষক একাধিকবার কবিতাটির রসগ্রাহী পাঠ দিতে পারেন—তবে বারংবার মামুলি পাঠের দ্বারা শ্রেণীকক্ষে যেন একঘেয়েমির সৃষ্টি না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

বোর্ডের কাজ—

পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে চলবে বোর্ডের কাজ। ছাত্রদের কাছ থেকে নিষ্কাশিত উত্তরগুলি শিক্ষক আরো মার্জিত এবং সংক্ষিপ্ত করে বোর্ডে লিখে দেবেন অর্থাৎ ছাত্রের সহযোগিতায় শিক্ষক সেই দিনকার পাঠের সংক্ষিপ্ত সারটি বোর্ডে লিখে দেবেন পাঠের গতি অনুসরণ ক'রে। সাহিত্যপাঠে বোর্ডের কাজ

খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কিছু কিছু তুলনীয় কবিতা লিখে দেওয়া যেতে পারে। অথবা কিছু কিছু দুরূহ শব্দ থাকলে ছাত্রের সহযোগিতায় তার উত্তর লিখে দেওয়া ভাল। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে পাঠের রসানুভূতির উদ্দেশ্যটি যেন শব্দার্থ ও ব্যাকরণের ঝঞ্ঝাবাতে উড়ে না যায়।

দ্রুত পঠনের বেলায় গল্পের মূল বিষয়টি কয়েকটি খণ্ডে ভাগ করে প্রত্যেক খণ্ডের শিরোনামা লিখে দিতে হয়—তাতে ছাত্রের পক্ষে গল্পের কাহিনীকে অনুসরণ করা সহজ হয়।

রচনা লেখাতেও বিষয়বস্তুর কয়েকটি সঙ্কেত বোর্ডে লিখে দিলে রচনা লেখার পক্ষে সুবিধা হয়।

ব্যাকরণ শেখাতে বোর্ডের সাহায্য ত অপরিহার্য, অবরোহ পদ্ধতিতে সূত্র নিষ্কাষণ করতে হয়।

অভিযোজন

এইভাবে পাঠদান শেষ হয়ে গেলে আমরা পাঠটীকার তৃতীয় সোপান বা শেষ সোপানে উপনীত হলাম। এর নাম অভিযোজন (Application)—এই অংশে দেখতে হবে ছাত্র এতক্ষণ ধরে যে জ্ঞান অর্জন করেছে তার সুষ্ঠু প্রয়োগ তার দ্বারা সম্ভব কিনা। যে অংশ তারা শিখল তারি সাহায্যে যে অংশ তখনও শেখেনি তাতে কিছু আলোকপাত করতে পারে কিনা।

প্রয়োগকৌশল না শিখলে জ্ঞানের ত কোন মূল্যই নেই। নানাবিধ সমস্যার সমাধানে অর্জিত-জ্ঞানের যদি কোন সাহায্য আমরা না পাই, তবে সে জাতীয় জ্ঞানের মূল্য কী ? সুতরাং এই অংশে এমন কতকগুলি সুনির্বাচিত প্রশ্ন করতে হবে যার সাহায্যে ছাত্রের জ্ঞানের রসানুভূতির এই অভিযোজন ক্ষমতা যেন আমরা বুঝতে পারি।

বাড়ীর কাজ

পরিশেষে কিছু বাড়ীর কাজ উল্লেখ ক'রেই পাঠটীকার কাজ শেষ। বাড়ীর কাজ অবশ্য এমন কিছু হবে না যাতে ছাত্রের বিরক্তি উৎপাদন করে। বুদ্ধির পরিচয়, আগ্রহের পরিচয়, রসানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় এমন কিছু সুনির্বাচিত হাল্কা কাজ দিতে হবে।

মোটকথা পাঠ-পরিকল্পনার প্রধান তিনটি অংশ—প্রথমে শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ জাগাতে হবে, রসানুভূতির সঞ্চার করতে হবে অর্থাৎ ক্ষেত্র প্রস্তত করতে হবে।

Q 6. The wise teacher tries to harness the play spirit for the development of mind and character.

Ans. Paper II নং প্রশ্ন (পৃঃ—) দ্রষ্টব্য।

Q. 7. Enumerate and explain the advantages and disadvan-tages of new types of tests.

Ans. Paper II.

Q. 8. "A good School besides the usual course of instruction, should seek by other means to be of service to the children who atten it". Name some such means and discuss at least one of them.

Ans. ১৯৬০ সালের Paper IV ২নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

Published by :
B. L. Chakravorty, B.Sc.
127A, S. P. Mookherjee Road,
Calcutta-26

Printed by :
M/s. Hind Printing Works

Cover Printed by :
The Modern Press
14C, Tara Road,
Calcutta-26